সৈকত

ট্রফি

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৫৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৫৯

মূল্য—দুই টাকা

ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও
শ্যামসুন্দর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

কবি গোবিন্দ চক্রবর্তীকে

বিক্রমজিৎকে প্রথম আমরা আবিষ্কার করি কলেজের মাঠে। ইণ্টারক্লাশ ক্রিকেট টুর্ণামেণ্টে।

তখন আমাদের থার্ড ইয়ার। সেকেণ্ড ইয়ারের সঙ্গে ফাইন্যাল খেলা সেদিন। কলেজের মাঠে পৌঁছে দেখি, আমাদের ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি বসে পড়েছে মাথায় হাত দিয়ে—প্লেয়ারদের মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ। ওদিকে সেকেণ্ড ইয়ারের দলটাতে চলেছে একটা উল্লসিত জটলা।

—ব্যাপার কী ব্যানার্জি, কী হল? সমস্বরে জানতে চাইলাম আমরা।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্যানার্জি, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—সর্বনাশ! সে কি!

কালো মুখখানাকে আরো কালো করে ব্যানার্জি বললে, অখিল সেন ডুবিয়েছে আমাদের।

অখিল সেন! বলে কী! আমাদের ক্লাশের চৌকোস খেলোয়াড় সে। মারাত্মক ফাস্ট বোলার, তেম্‌নি দুর্দান্ত ব্যাটস্‌ম্যান—কলেজের ব্র্যাডমানই বলা যায় তাকে। ফাস্ট

ইয়ারের সঙ্গে খেলায় একাই বিরাশী রাণ তুলেছিল অখিল সেন। দুর্দান্ত তার ক্যারিয়ার, প্রতিপক্ষের সে মূর্তিমান আতঙ্ক।

—কী হয়েছে অখিলের ?

—একশো চার জ্বর। চোখ টকটকে লাল, ভুল বকছে। এতক্ষণ বসে বসে আইস্-ব্যাগ দিচ্ছিলাম, যদি কোনোমতে টেম্পারেচারটা নামিয়ে-টামিয়ে মাঠে এনে হাজির করতে পারি। কিন্তু উঁহু—একেবারে ইম্‌পসিব্‌ল !

এবার ব্যানার্জির পাশে আমরাও বসে পড়লাম। মাঠে নয়, স্রেফ পথে বসলাম।

—উপায় ?

—উপায় নেই—কান্নাভরা গলায় ব্যানার্জি বললে, সিয়োর ট্রফিটা সেকেণ্ড ইয়াবই নিয়ে গেল।

একজন মরিয়া হয়ে বলে ফেললে, ছাড়া হবে না অখিলকে। ওই অবস্থাতেই টেনে নিয়ে এসো ফিল্‌ডে।

—তার পব ? উকিলের ছেলে ব্যানার্জি নিদারুণ মনোভঙ্গে আর বিরক্তিতে বিশ্রী মুখ করে খিঁচিয়ে উঠল : তারপর মাঠে এসে প্রাণটা দিলে কাল্‌পিব্‌ল হোমিসাইডের ধারায় ফাঁসিতে ঝুলবে কে—তুমি ?

ওদিকে আর সময় নেই তখন।

অসহায় ভাবে উঠে দাঁড়ালো ব্যানার্জি। বললে, একজন শর্টেই খেলতে হবে দেখছি। কেউ রাজী হচ্ছে না—আর নিচের ক্লাশের ছেলেদের কাছে অপদস্থ হতেও রাজী নয়। আর জানি

তো সব কটাকেই—বল পিটতে গিয়েতো স্রেফ উইকেট উড়িয়ে দেবে।

—তা হলে উপায় ?

—ভগবান ঃ—কলেজের ডিবেটে ব্যানার্জি ঈশ্বরকে তুলো-খুনো করে উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এবার তার গলায় সত্যি-কারের আধ্যাত্মিকতার সুর এসে গেল ঃ তিনি ভরসা।

পাশ দিয়ে সাইকেলে করে যাচ্ছিল সেকেণ্ড ইয়ারের একটা ছাত্র। কথাটা বোধ হয় শুনে ফেলেছে। টিপ্পনী কেটে গেল ঃ এলাহী ভরসা।

ব্যানার্জির চোখ ধ্বক্ করে উঠল ঃ উঃ, কী অপমান! এমন একজন কেউ নেই যে থার্ড ইয়ারের মুখ রাখতে পারে? অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাতে তাকাতে ব্যানার্জি হঠাৎ খপ্ করে বিক্রমজিতের হাত চেপে ধরল ঃ এই যে, তুমিই নেমে পড়ো!

বিক্রমজিৎ এতক্ষণ নীরবে সব শুনে যাচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে নিঃশেষ করে চলেছিল পুরো একটি ঠোঙা চীনে বাদাম। ব্যানার্জির কথায় হাত থেকে ঠোঙাটা পড়ে গেল তার। বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

—আমি! বিক্রমজিৎ সভয়ে বললে, আমি!

—হাঁ—হাঁ, তুমি—চলে এসো—

—কিন্তু জীবনে আমি কখনো ক্রিকেট ব্যাট ধরিনি যে—একান্ত অসহায় শোনালো বিক্রমজিতের স্বর।

—কুছ্ পরোয়া নেই। রাণ করবে সে ভরসা রাখি না, তবে একটা জায়গান্টিক ফিগার তো রয়েছে। ভয় ধরিয়ে দিতে হবে—সেইটেই আসল কথা। এসো নেমে পড়ো—

ব্যানার্জি বিক্রমজিতের হাত ধরে আকর্ষণ করলে।

—হারি আপ!

আর ভাববার সময় না দিয়ে একটানে বিক্রমজিৎকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়ল ব্যানার্জি। বিক্রমজিৎ ক্ষীণ কণ্ঠে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমাদের সমবেত জয়ধ্বনিতে তার কথা মুহূর্তে গেল তলিয়ে।

সেদিনকার সে খেলার কথা ভুলব না। মাঠের মাঝখানে কী আশ্চর্য মহিমাতেই যে দাঁড়িয়েছে বিক্রমজিৎ! সমস্ত প্লেয়ারদের সঙ্গে তুলনা করে তাকে মনে হচ্ছে সম্রাটের মতো। টক্‌টকে গায়ের রঙ—লম্বায় পাঁচ হাতের চেয়ে বেশি উঁচু—যেমন স্বাস্থ্যবান্, তেমনি সুপুরুষ। খাঁটি রাজপুতের ছেলেই বটে। আবু পাহাড়ের পাথরে পাথরে ছুটন্ত ঘোড়ার দ্রুতগতিতে ওর বর্মচর্মধারী সোয়ার মূর্তিটাই মানায় ভালো, বরিশাল কলেজের এই সবুজ সমতল খেলার মাঠে জায়গা নয় ওর!

কিন্তু মহিমান্বিত চেহারা হলে কী হবে, ফিল্‌ডিং যা করেছিল তা অকথ্য দস্তুরমতো। দুটো সোজা ক্যাচ ফস্-ফস্ করে ফেলে দিলে, লেগে-পিটোনো একটা বল ধরতে গিয়ে অতিকায় শরীর নিয়ে অশোভন রকমের ডিগবাজী খেলো একটা। চারদিক থেকে ধিক্কারে ধিক্কারে আমরা ওকে জর্জরিত করে

তুললাম, আরো বেশি করে ছাতু খাওয়ার জন্যে অযাচিত উপদেশও বর্ষণ করলাম।

বিক্রমজিৎ নির্বিকার।

ঝাড়া তিন ঘণ্টা পিটি [illegible] য়ার যখন ব্যাট ছাড়ল, তখন স্কোর-বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আমাদের চক্ষুঃস্থির। অখিল সেন থাকলে তবু ভরসা ছিল, কিন্তু এত রাণ তোলার মত স্টেডি-প্লেয়ার আমাদের একজনও নেই! থার্ড ইয়ার ডুবল।

আশঙ্কা যে সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন লাঞ্চের পরে পটাপট উইকেট পড়ে যেতে লাগল আমাদের। আমাদের সাতটা উইকেট যখন নেমে গেছে, তখন রাণ ওদের অর্ধেকের কাছাকাছিও পৌঁছয়নি। শুধু থার্ড উইকেট থেকে ব্যানার্জি কোনো মতে টিঁকে আছে—যা ত্রু-চারটে রাণ সেই তুলছে। কিন্তু কতক্ষণ আর! জুটি না পেলে নট্ আউট থেকেই বা কতটুকু করবে ব্যানার্জি?

এমন সময় প্যাড্ পরে মাঠে নামল বিক্রমজিৎ।

আমরা ব্যঙ্গ করে তাকে অভিনন্দন জানালাম, শেয়াল-কুকুর ডাকল সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রেরা। কিন্তু তার পরে যা ঘটল তাকে মির‍্যাক্‌ল্ বললেও কম বলা হয়।

আনাড়ীর মতোই ব্যাট্ ধরেছিল বিক্রমজিৎ—প্রথম বলটা আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আনাড়ীর মতো প্রবল ভাবে হাঁকড়ে দিলে সে। সে কি হিট্! আমরা ব্যাপারটা ভালো

করে বোঝবার আগেই দেখি নক্ষত্রবেগে বল ওভারবাউণ্ডারীর সীমা ছাড়িয়ে মাটিতে গিয়ে ড্রপ নিয়েছে।

আমরা সমস্বরে চীৎকার করে উঠলাম। ব্যানার্জি ছুটে এসে বিক্রমজিতের পিঠ চাপড়ে দিলে।

তারপরেই হাত খুলল বিক্রমজিতের।

আনাড়ী বলেই হিসেব-নিকেশ বাছ-বিচার করল না, নির্ভয়ে বেপরোয়া হয়ে সে পিটতে লাগল। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে বল উড়ে যেতে লাগল কামানের গোলার মতো। ক্যাচ ধরতে গিয়ে আর্তনাদ করে বসে পড়ল উইকেট-কীপার—বল ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে বাউণ্ডারী হয়ে।

পাঁচটা ওভারবাউণ্ডারী আর আটটা বাউণ্ডারী করে যখন ক্লিন বোল্ড হয়ে গেল বিক্রমজিৎ, তখন ট্রফি আমাদের হয়ে গেছে। ওদিকে হাত খুলেছে ক্যাপ্টেনেরও—তাল দিয়ে পিটিয়েছে সমানে। হাতে দুটো উইকেট তখনো বাকি।

আকাশফাটানো জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে যুদ্ধজেতা রাজপুত বীরের মতোই ফিরে এল বিক্রমজিৎ।

একদল ছেলে তৈরীই ছিল—তাকে কাঁধে করে মাঠের মধ্যে দিয়ে শোভাযাত্রা সুরু করলে।

বিক্রম বললে, আঃ, ছাড়ো ছাড়ো, লাগে—

সে কথা কেউ শুনল না।

কিন্তু ওইখানেই শেষ।

আশ্চর্য লোকটা—আর তাকে নামানোই গেল না ক্রিকেটের

মাঠে। হেসে বললে, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, বারে বারে কি আর ধান খায় ঘুঘুতে? আমাকে আর টেনো না ভাই—ও আমার পোষাবে না। ফাণ্ডামেণ্টালি আমি স্পোর্টস্‌ম্যান নই।

ব্যানার্জি অনেক সাধাসাধি করে শেষে গাল দিয়ে চলে গেল। বললে, খোট্টার মগজ তো, বুদ্ধি আর কত হবে। অথচ খেললে একটা অল্ ইণ্ডিয়া রেপুটেশন পেত।

বিক্রমজিৎ শুধু হাসল, জবাব দিলে না।

আর কেউ লক্ষ্য করেছিল কি না জানি না, কিন্তু প্রথম পরিচয়ের দিনটি থেকেই ওর হাসিটা কেমন বিস্ময় জাগিয়েছিল আমার মনে। খাঁটি রাজপুতের ছেলে—ওর বাবা ছিলেন ডিভিশন্যাল্ আর্মড ফোর্সের কর্তা। ওর চেহারা দেখলে মনে হত, ও-ও ওইরকম একটা সামরিক চাকরীই বেছে নেবে। কিন্তু আশ্চর্য ছিল বিক্রমজিতের হাসি। অমন কোমল, অত স্নিগ্ধ হাসি আমি দেখিনি।

সে হাসি মেয়েদের মতো। হাসত নিঃশব্দে, অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে। ঠাট্টা করলে মেয়েদের মতোই চোখ নামিয়ে নিত মাটিতে, গাল রাঙা হয়ে উঠত। চার-পাঁচ পুরুষ বাংলা দেশে থেকে রীতিনীতিতে প্রায় বাঙালি হয়ে গেছে—অথচ কোনো বাঙালির সঙ্গেই মিশত না। শুধু বাঙালি নয়, কারুর সঙ্গেই মিশতে পারত না বললেই সুবিচার করা হয় ওর সম্পর্কে।

বিকেলে বেরুত একটা সাইকেল নিয়ে—বেল্‌স পার্কের ঝাউবন আর ভিড় ছাড়িয়ে চলে যেত বহুদূরে—একটা নির্জন কালভার্টের ধারে বসে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আলো-ডুবে আসা নদীর দিকে।

ছেলেরা বলত, দাম্ভিক।

কেউ কেউ মন্তব্য করত ঃ বাঙালির সঙ্গে মিশতে ভয় পায়।

যে যাই বলুক—থার্ড ইয়ার আর্টস্‌ ক্লাশের দেড়শো ছেলের মধ্যে একটা অতিকায় চেহারা ছাড়া আর কোনো বৈশিষ্ট্যই ছিল না বিক্রমজিতের। ক্রিকেটের মাঠে তার অলৌকিক বীরত্বের ব্যাপারটা আরো দশটা নতুন উত্তেজনার মধ্যে ঝিমিয়ে এল ক্রমে ক্রমে—ক্লাশের সেরা মেয়ে মণিকা সেনের দৃষ্টিও তেমন করে আর সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে এসে পড়তে লাগল না বিক্রমের ওপর। খেলার মাঠের সম্রাট কিছু দিনের মধ্যেই অনায়াসে হারিয়ে গেল নগণ্যতার মধ্যে, মিশে গেল তুচ্ছতমদের দলে।

কিন্তু আবার নতুন করে আমাকে চমক দিলে বিক্রমজিৎ।

কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনার ভারটা আমার ওপরেই ছিল। পদ-মর্যাদার গৌরব প্রথম প্রথম নেহাৎ খারাপ লাগছিল তা নয়, কিন্তু ক্রমশ জীবন দুঃসহ করে তুলল একেবারে। সম্মান জিনিসটা সুখের হলেও স্বস্তির যে নয়, এই জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি আমায় খেতে হল সেই উপলক্ষ্যে।

গাদা গাদা এবং খাতা খাতা লেখা নিয়ে ছেলেরা আমায় তাড়া করতে লাগল ; লোহার মুগুর দিয়ে ঠুকলেও যাদের মগজ

থেকে বিন্দুমাত্র সাহিত্য-বোধের সাড়া পাওয়া যাবে না, কে জানত তাদের মধ্যে এতগুলো কবি, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ? রবিবার দিন যখন লেখার স্তূপ সামনে নিয়ে বসে ভাবছি একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দিয়ে সংক্ষেপে আপদ মিটিয়ে ফেলব কি না, এমন সময় বাইরে থেকে একটা সাইকেল-বেলের শব্দ শুনতে পেলাম।

বেরিয়ে দেখি, বিক্রমজিৎ।

ক্লাশে এক বেঞ্চিতে বসে বলে একটুখানি হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল আমাদের মধ্যে। তা ছাড়া কেন বলতে পারি না, ওর প্রতি এক ধরণের আকর্ষণও অনুভব করতাম আমি। হয়তো সেটা ওর ওই স্বাস্থ্যবান্ দীর্ঘ শরীরের জন্যেই। নিজে আমি যেমন রোগা, তেমনি ডিস্‌পেপটিক। তাই হয়তো ওর ওই মস্ত শরীর একটা প্রাকৃতিক মোহই জাগিয়ে তুলত আমার মনে। একজন রসিক অধ্যাপক প্রায়ই পাশাপাশি আমাদের দুজনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতেন ঃ দ্যাখো, গুপ্ত আর সিং যেন লিভিং অ্যাড্‌ভারটাইজ্‌মেণ্ট—'জোয়ান-বটিকা' সেবনের পূর্বে ও পরে!

সাদরে অভ্যর্থনা করলাম ওকে, ডেকে নিয়ে বসালাম ঘরে। কিছুক্ষণ মেয়েদের মতোই সলজ্জ দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল বিক্রমজিৎ। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘর্মাক্ত কপালটাকে মুছে ফেলল।

বললাম, হঠাৎ কী মনে করে হে ?

বিক্রম জবাব দিতে পারল না। লক্ষ্য করলাম, ওর ফর্সা গালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে আবীরের গুঁড়োর মতো রক্তের কণা, চোখের দৃষ্টি সীমাহীন সংকোচে যেন এসেছে জড়িয়ে জড়িয়ে।

—ব্যাপার কী ?

বিক্রম একটা ঢোঁক গিলল। ওর দিকে তাকিয়ে মনে হল, লজ্জায় ভয়ে অত বড় দীর্ঘ আর শক্তিমান দেহটা যেন সংকুচিত হয়ে গেছে—নিজেকে যেমন বিব্রত তেমনি অপরাধী বোধ করছে ও। বললে, আমার একটা লেখা—

—লেখা !—আমি ভ্রূকুঞ্চিত করলাম: ব্যায়াম সম্বন্ধে ? না, অড়হর ডালের উপকারিতার বিষয়ে গবেষণা ?

আরো বিব্রত হয়ে গেল বিক্রম। তোৎলিয়ে বললে, না, না, ওসব কিছু না।—তারপর যেন পালাতে চাইছে, এমনি ভাবে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা, আমি চলি।

ওর দিকে তাকিয়ে এবার কেমন করুণা হল আমার—মনে হল, আমার বাড়িতে ও এসেছে অথচ আমি অপমান করছি ওকে ! বাধা দিয়ে বললাম, বোসো, চা খাও।

—না, চা তো আমি খাই না।

—তবে কী খাও ? পেস্তার সরবৎ ? কাঁচা ছোলার হালুয়া ? গাজর আর টোমাটোর রস ?

—না, ওসব কিছুই আমি খাই না।—বিক্রম এবার ব্যথিত আর বিষণ্ন চোখে তাকালো আমার দিকে, আচ্ছা, এ সমস্ত কথা

তোমরা কেন ভাবো বলতে পারো সুকুমার? তোমরা কি মনে করো, এত বড় শরীরটা আছে বলেই অত্যন্ত ভাল্‌গারের মতো তার তোয়াজ করা ছাড়া আর কোনো কাজই নেই আমার?

ওর কথার সুরে আমার খোঁচা লাগল। তবু লঘুভাবে বলতে চেষ্টা করলাম: না হলে অমন চেহারা হয়? অমন করে ওভার-বাউণ্ডারী পিটতে পারে কেউ?

বিক্রম বললে, না। শরীরকে ঘোষণা করাই রাজপুতের একমাত্র কাজ নয়! তোমরা আমাদের বীরত্বের ইতিহাসই পড়েছো, কিন্তু তার মধ্যে আমাদের জাতির সম্পূর্ণ পরিচয় কোথায়? আমাদের দেশে শুধু চারণই ছিল না, কবিও ছিল। রক্ত দিয়ে মাটি রাঙানোই আমাদের একমাত্র সত্য নয়, রাজপুত আর্টও যে একদিন কত বড় হয়ে উঠেছিল সে খবর তোমরা রাখো না।

আমি বললাম, কী বলছ তুমি?

বিক্রম বলে চলল: যেটা সত্যি তাই বলছি। টডের রাজস্থান আমাদের ইতিহাসের একটা ভগ্নাংশ মাত্র, তার সম্পূর্ণ রূপ নয়। সে ইতিহাসে ক্ষত্রিয় আছে, ব্রাহ্মণ নেই। তলোয়ার আছে, তুলি নেই। আমাদের রুক্ষ পাহাড়ের চূড়োয় তোমরা ডঙ্কা বাজতেই শুনেছ খালি, কিন্তু শোনোনিতো ভুট্টার ক্ষেতের আড়ালে আড়ালে চাষার মেয়ের গলায় কোন্ গান মুখর হয়ে ওঠে।

আশ্চর্য, মুখের ওপর থেকে সেই লজ্জার রক্তিমাভাটা কেটে গেছে বিক্রমের, চোখ থেকে সরে গেছে সেই সঙ্কোচ আর দ্বিধার আবরণটা। হঠাৎ কোথা থেকে যেন শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে ও—ওর শরীরে একটা অসংশয়িত প্রবল বলিষ্ঠ পৌরুষ উঠেছে তরঙ্গিত হয়ে।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, কী বলতে চাও তুমি ?

—আমি বলতে চাই—বিক্রম নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল ঃ শারীরিক শক্তিটা মানুষের আদিম গুণ, তার Primitive qualification, আজ ওইটে দিয়েই বিচার করতে গেলে তার অসম্মান করা হবে। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের বীরত্বের কাহিনী তো অনেক শুনেছো—শুনেছো নির্ভয়ে প্রাণ দেবার অনেক চাঞ্চল্যকর গল্প। কিন্তু শোনোনি কি, মৈত্রির রাজপুত্র যুদ্ধে হত হবার পরেকার সেই চোখের জলের কথা : সেই রাজবধূর সহমরণ ?—সুরেলা গলায় বিক্রম চমৎকার আবৃত্তি করে গেল ঃ

"কানে মোতি বল্‌বলা,
গলে সোণি এ মালা
আশী কোশ করহ আয়া
কোঙার মেহেত্রিওয়ালা—"

আমি মুগ্ধভাবে চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর জানতে চাইলাম আবার।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ শক্তির ক্ষেত্রে মানুষ আর পশুর ধর্ম এক—বরং পশুই তার আদর্শ। সিংহের মতো জোয়ান বললে মানুষ গৌরব বোধ করে, নামের শেষে সিংহ লিখে তার আত্মপ্রসাদের সীমা থাকে না। কিন্তু এ তো এগিয়ে যাওয়া নয়। যে মানুষ যত বেশি শিল্পসৃষ্টি করে, রচনা করে বিজ্ঞান, পশুর সঙ্গে তার ব্যবধান ততই বেশি। আর এই ব্যবধানকে আমরা যতটাই বাড়িয়ে নিতে পারব ততটাই আমাদের গৌরব। বলতে পারো আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয়।

আমি স্তব্ধ-বিস্ময়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম ওর। আমাদের চিরচেনা বিক্রমের গলায় হঠাৎ সরস্বতী ভর করল নাকি, কোনো দেবতার আশীর্বাদে সে লাভ করে বসল কথা বলবার এই অলৌকিক শক্তি?

বিক্রম উত্তেজিত ভাবে বলে চলল, অথচ ওই পশুশক্তির সম্মানটাই তোমরা আমাদের দিয়ে আসছ। কিন্তু আমাদের জন্যে কি শিল্প থাকবে না, আর্ট থাকবে না, থাকবেনা ন্যাশনালিটি? এ অবিচার কেন করছ? জানো, বাঙালিদের ওই রকম হিংস্র শরীর নেই বলেই আজ কাল্‌চারের দিক থেকে তারা এত এগিয়ে গেছে? যদি বাঙালি পাঞ্জাবীর মতো লম্বা-চওড়া-চৌকোষ হত আর গালে গালপাট্টা রাখত, তাহলে এদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হত না।

—বাঃ, একটা বেশ নতুন ধরণের থীসিস্‌ শোনাচ্ছ তো?

—থীসিস্‌ নয়, এ আমার উপলব্ধি। বিশ্বাস করো সুকুমার

শুধু আজ নয়, অনেকদিন থেকেই কথাটা আমি ভেবে আসছি, বহুদিন থেকেই এ নিয়ে প্রতিবাদ জেগেছে আমার মধ্যে।

চির-নীরব এবং স্বভাব-সংকুচিত বিক্রমের এই উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার তোড়ে আমি কিছুক্ষণ রইলাম অভিভূত হয়ে। কথা-গুলো যা বলছে তার কতটা সত্যি এবং তা নিয়ে কতটা তর্ক করা চলে, এটা যাচাই করে নেবার মতো মনের অবস্থা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। শুধু নিঃশব্দে বিস্ময়ে তাকিয়েই রইলাম —বলে কী বিক্রমজিৎ !

হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠল বিক্রম, যেন নিজেকে হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলার লজ্জায় মুহূর্তে বিবর্ণ আর বিমর্ষ হয়ে গেল সে। চট করে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, না ভাই, আজ আমি যাই—

বললাম, দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার লেখা দিয়ে গেলে না ?

—সে থাক—

—থাকবে কেন ? এসেছ যখন, দিয়েই যাও আমাকে।

—নাঃ, দরকার নেই—বিক্রম মাথা নত করল।

—লেখা এনেছ তাতে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন ? কলেজ ম্যাগাজিন তো সকলের লেখার জন্যেই—আমি ওকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলাম।

—কিন্তু আমি যে গোটাকয়েক কবিতা এনেছিলাম—প্রায় আবছায়া গলায় বললে বিক্রম।

—কবিতা ?—আমি আর্তনাদ করে উঠলাম : কী, রাজপুত ভাষায় ? ‘গলে সোণি এ মালা ?’

—না—বিক্রম আবার চোখ তুলল, আবার তীক্ষ্ণ-তীব্র হয়ে উঠল তার দৃষ্টি : বাংলা দেশে থাকি আমি—বাঙালি। রাজপুত ভাষায় লিখতে যাব কেন ?

সত্যি কথা বলতে কি, এবার মনে-মনে অনুশোচনা বোধ করলাম আমি। ওই চেহারা নিয়ে বিক্রম যা কবিতা লিখেছে, না পড়েও তা অনুমান করা দুরূহ নয়। ভাব, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে দস্তুরমতো গদাযুদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহ। নাঃ, ভদ্রতা করে ওকে বাধা দেওয়াটা ঠিক হয়নি ওকে—সসঙ্কোচে এবং সসম্মানে চলে যেতে দেওয়াই উচিত ছিল বোধ হয়।

কিন্তু যা হয়ে গেছে তার আর কোনো প্রতিষেধক নেই এখন। কান্না-ভরা মুখ করেই আমি বললাম, আচ্ছা, তবে দিয়ে যাও—

কোটের পকেট থেকে একখানি বড় এন্‌ভেলপ বের করে আমার হাতে দিলে বিক্রম। তার পরে আর সে মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করলে না। বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেল বাইরে, পরক্ষণেই শুনলাম, তার সাইকেলের শব্দটা দ্রুতবেগে রাস্তার মোড়টা পার হয়ে গেল—ভীরুর মতো পালিয়ে গেল পাঁচ হাতের চাইতেও বেশি উঁচু—বীরমূর্তি বিক্রম।

প্রচুর আশঙ্কা নিয়েই এন্‌ভেলপটা খুললাম আমি। এবং

আশঙ্কা নির্ভুল। চমৎকার নীল রঙের কাগজে, তিন দিকে লাল কালির মার্জিন টেনে একরাশ প্রেমের কবিতা লিখেছে বিক্রম।

লেখাগুলো পড়তে গিয়ে দেখি প্রচুর আকুতি আর আন্তরিকতা প্রতিটি কবিতা থেকে পড়ছে ক্ষরিত হয়ে। কবি-মন বিক্রমের আছে, বলতেও চেষ্টা করেছে যথাসাধ্য দরদ দিয়ে। কিন্তু তবু সেগুলো কবিতা হয়নি। প্রতি লাইনে ছন্দপতন, 'করিল'র সঙ্গে বসিয়েছে 'চঞ্চলের' মিল—আব রবীন্দ্রনাথকে এমন ভাবে অনুকরণ করেছে যে, পংক্তিতে পংক্তিতে একেবারে আক্ষরিক ছাপ পড়ে গেছে তার।

ধানক্ষেত, নদীর জল আর হংস-বলাকা,—এই হল ওর অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু। এরই ভেতরে দেখতে চেয়েছে একটা শ্যামলী মেয়েকে—দেখতে চেয়েছে তার কালো চোখ থেকে কী ভাবে ভ্রমরের মতো দৃষ্টি উড়ে যাচ্ছে কোনো ঘন মেঘের উদ্দেশ্যে। ওর কল্পনা নৌকো ভাসিয়েছে বাংলা দেশের কোনো গন্ধ-মাতাল পদ্মবিলের জলে—সেখানে চিত্র-গাগরী ভরে জল নিতে এসেছে কোনো এক অনামিকা পত্রলেখা। শিউলি-ফোটা কোনো এক শরতের সোনা-গলে-পড়া সকালে হাঁসের পাখার মতো মেঘে মেঘে সঞ্চারিত হয়ে ওর মন চলে গেছে অঞ্জনা নদীর পারে খঞ্জনা গাঁয়ে—সেখানে, যেখানে খোঁপায় শিউলি-মালা জড়িয়ে রঞ্জনা শুনছে বিদেশিয়ার বাঁশির সুর।

লোকটার বাংলা দেশের প্রতি আশ্চর্য রকমের প্রীতি—কোনো সন্দেহ নেই ! ছুটো চারটে লাইন পড়ে আমারও মন্দ লাগলনা :

আমার বাঁশি কুড়িয়ে পেলাম
বংশীবটের শান্ত ছায়ায়—
সুর এল তার মৌ-ঝরানো
প্রাণ-হারানো দখিন্ হাওয়ায়।
আমার বাঁশির ব্যাকুল গানে—
কোথায় চলি কেই বা জানে—
প্রজাপতি মনকে আমার
উধাও পথে আজকে কে পায় ?

কিংবা :

পায়ে তার নূপুরের উন্মন-ছন্দ—
আকুলিত কেশপাশে চম্পার গন্ধ।
উচ্ছল গাগরী
ধীরে চলে নাগরী—
টুটে যায় হৃদয়ের সব কিছু বন্ধ—
মোর বুকে এল একি যৌবনানন্দ !

যৌবনানন্দ এল—তার তাড়ায় কবিতাও লিখে ফেলেছে রাশি রাশি। আকুলি-বিকুলি যথেষ্ট করেছে সন্দেহ নেই, তবু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। প্রায়ই শেষে গিয়ে এমন হোঁচট্ খেয়েছে যে, ওই ছু-একটা ভালো ভালো লাইনও একেবারে

মাঠে মারা গেছে বিক্রমের। সরস্বতীর বন্দনা করতে গিয়ে যখন তখন দু-চার ঘা লাঠিও বসিয়ে বসে আছে তাঁকে।

ওর কথাগুলো মনের মধ্যে বাজতে লাগল। একটা নতুন কিছু করবার চেষ্টা করছে। বাংলা দেশকে ভালোবাসে, বাঙালির ওপরে দেখা যাচ্ছে বেশ একটা রোম্যান্টিক্ শ্রদ্ধা। তাই শক্তিকে বিসর্জন দিয়ে শিল্পের আরাধনা করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শক্তি জিনিসটা ওর মজ্জাগত, রূঢ় কাঠিন্যটা ওর জাতিগত উত্তরাধিকার। সে উত্তরাধিকারকে অতিক্রম করে চলে যাবে এমন শক্তি কোথায় বিক্রমের? তাই বার বার নিজের জালে জড়িয়ে গেছে, ওর সূক্ষ্ম রুচিবোধকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে একটা গন্ধময় কর্কশতা, পংক্তিতে পংক্তিতে অশোভন রসাভাস!

আমি যেন ওর ভেতরকার সেই আশ্চর্য দ্বন্দ্বটাকে বুঝতে পারলাম। এ ওর নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান—স্বধর্মের বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা। কিন্তু সে যুদ্ধে ও জয়লাভ করতে পারেনি। ওর নায়িকা যখন অভিসারিণীর বেশে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কোনো 'বরষণমুখরিত' শ্রাবণ রাত্রে—তখন ওরই ভেতরের সত্তা যেন রাক্ষসের মতো রোমশ কর্কশ একটা মুঠি প্রসারিত করে সে নায়িকার গলা টিপে ধরেছে!

বাস্তবিক, নিষ্ঠুর একটা ট্র্যাজেডিই বটে!

একটু কষ্ট হল, হাসিও পেল সঙ্গে সঙ্গে। আরে বাপু, তলোয়ার দিয়ে দাড়ি-চাঁছা কি আর সম্ভব। অগত্যা কবিতা-গুলোকে আমি সরিয়ে রাখলাম রাশি রাশি অমনোনীত বাক্সে

লেখার গাদায়। হাজার বন্ধুত্বের খাতিরেও এর কোনো একটি রচনাকে ম্যাগাজিনে স্থান দেওয়া যাবে না।

পরদিন কলেজে দেখা হতেই আমি কথাটা তাকে জানালাম।

এবং জানালাম যথোচিত ক্ষোভ আর কুণ্ঠার সঙ্গে। চকিতে বিক্রমের মুখ বেদনায় বিমর্ষ হয়ে গেল : কিছুতেই চলবে না ?

—না ভাই।

—ওঃ।

আমি সান্ত্বনা-ভরা উপদেশ দিয়ে বললাম, আমার মনে হয়, কবিতার লাইন তোমার নয়। তার চাইতে যদি ব্যায়ামের পূর্বে কতটা ভিজে ছোলা খাওয়া উচিত এ সম্বন্ধে কিছু লিখে দাও—

—ঠাট্টা করছ ?—বিক্রমের বিশাল কালো চোখ দুটো উঠল ধ্বক-ধ্বক করে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই। তার পরেই সামনে থেকে গট-গট করে সরে গেল সে।

পেছন থেকে সকৌতুকে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলাম আমি। কালকে ওর দীর্ঘ বক্তৃতার শোধ নিয়েছি, নিয়েছি একটা নোব্‌ল রিভেন্‌জ্‌ !

সেই থেকে আরো নিরাসক্ত আর নির্বিকার হয়ে গেল বিক্রম। আগে আমার সঙ্গে যা-হোক দুটো-চারটে কথা সে বলত, তাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এল এর পর থেকে !

কলেজে এসে একেবারে লাস্ট বেঞ্চিতে বসত, সমস্ত পিরিয়ড কটা কেমন তাকিয়ে থাকত স্বপ্নাতুর আচ্ছন্ন চোখ মেলে। মনে হত, প্রোফেসারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তার চোখ দুটো অনেক দূরে ছড়িয়ে চলে গেছে—চলে গেছে এই কলেজের লাল বাড়িটা ছাড়িয়ে, এই শহর ছাড়িয়ে, নদী পার হয়ে—কোনো একটা অপরিচিত আর অপূর্ব জগতের স্বপ্নে একান্ত ভাবেই নিমগ্ন হয়ে আছে সে।

কিছু দিনের মধ্যেই দেখলাম, বাঙালির মতো করে ধুতি-চাদর পরতে শুরু করেছে সে। তারও পরে আসতে লাগল একটার পর একটা কৌতুক এবং কৌতূহলজনক সংবাদ।

বিক্রম বাড়িতে বসে ছবি আঁকা শিখছে। অবশ্য অরিয়েণ্টাল, অক্সিডেণ্টাল, না হনোলুলুয়ান—তা জানা যায়নি।

কাল চৌধুরী কোম্পানীর দোকান থেকে একটা সেতার কিনে নিয়ে গেছে সে। আশা করা যায় 'সারেগামা' রপ্ত হবার আগেই অন্তত দশটা লাউয়ের খোলা ফাটবে।

সংপ্রতি বাড়িতে রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা হচ্ছে তার। মতান্তরে রবীন্দ্রনাথের চচ্চড়ি হচ্ছে বলাও যায়।

প্রতিবেশী ফণী একটা রসালো টিপ্পনী সহযোগে খবরটা পরিবেশন করলেঃ ফলে ওদের পাড়ার সমস্ত কুকুরগুলো পালিয়ে গেছে। একটা আচমকা মারাও গেছে শোনা যায়!

বলা বাহুল্য, খবরগুলো শুনে খুব হাসাহাসি করেছিলাম আমরা। সত্যি বলতে কি, বিক্রম সম্বন্ধে এক ধরনের সমবেদনা

তখনো ছিল আমার। কিন্তু আমাদের সহপাঠী বন্ধু সুরসিক ফণী সমস্ত ব্যাপারগুলোর এমন বিচিত্র ও সরস ব্যাখ্যা করত যে কৌতুকের প্রবল বন্যায় সমস্ত সমবেদনা যেত তলিয়ে। ওই কণ্ঠ আর চেহারা নিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত গাইছে বিক্রম! ব্যাপারটা কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটা ঘটনা ঘটল যে হাসি বন্ধ হয়ে গেল আমাদের।

প্রথমে আমারই চোখে পড়েছিল যে মেয়েদের 'কমন-রুমের' সম্মুখের প্যাসেজ্‌টাতে দাঁড়িয়ে রূপেগুণে ক্লাসের সেরা ছাত্রী মণিকার সঙ্গে কী কথা কইছে বিক্রম। একে ভালো ছাত্রী, তাতে অত্যন্ত রাশভারী, আমরা কেউ কোনো দিন আমলই পাইনি মণিকার কাছে! কিন্তু বিক্রম তার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগ জুটিয়ে নিলে কেমন করে—কী উপায়ে?

একদিনের ব্যাপার হলে কথা ছিল না, কিন্তু দেখলাম, আস্তে আস্তে জিনিসটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। প্যাসেজে আলাপের সময়টা দীর্ঘায়িত হচ্ছে ক্রমশ, কথার সঙ্গে সঙ্গে মিলছে হাসির ঝিলিক। সে ঝিলিক সন্দেহজনক, আপত্তিকর এবং একটা বিপজ্জনক আগামী পরিণতির দ্যোতক।

ঈর্ষ্যায় আমাদের বুকের ভিতরে জ্বালা করে উঠল। বড় বেশি এগিয়ে যাচ্ছে বিক্রম—আমাদের ছাড়িয়ে ঘোড়া ডিঙিয়ে যেন ঘাস খেতে চাইছে সে। আমরা সব এতগুলো

ভালো ভালো ছেলে ঘোল খেয়ে গেলাম—এ তো দিব্যি জমিয়ে ফেলল দেখা যাচ্ছে !

তার পরে ফণীই আরো খবর সংগ্রহ করে আনল। লোকটার গোয়েন্দাগিরি করবার আশ্চর্য ক্ষমতা, যেন ভবিষ্যৎ জীবনে সুনিশ্চিত আই. বি. হওয়ার ঐশ্বরিক প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে ফণী।

বললে, বৃথাই ভালো ছাত্রত্বের গর্ব করো হে সুকুমার। ওই ছাতুটাই কাজ গুছিয়ে নিলে।

কলেজের রেস্তোরাঁয় চা খাচ্ছিলাম, খানিক গরম চা ছলকে পড়ল আমার আদ্দির পাঞ্জাবিটায়। বললাম, মানে ?

ফণী মুখ টিপে হিংসেয়-পোড়া হাসি হেসে বললে, তুমি পয়সা খরচ করে কলেজ রেস্তোঁরার পাঁচন গিলে মরছ, ওদিকে মহিষাসুর যে অমৃত-ভাণ্ড সাবাড় করে দিলে।

অধৈর্য হয়ে বললাম, রূপক রাখো ফণী। ব্যাপারটা একবার খোলসা করে বলো তো ?

—ব্যাপার আবার কী ? কাল মণিকা সেনদের লনে বসে বসে চা খাচ্ছিল বিক্রম। মণিকা সার্ভ করছিল—নিজের চোখেই দেখলাম। সে কি হাসি আর গল্প ! বুঝলে, something is going to happen !

এইবারে আমার স্পষ্ট মনে হল, নীরব উপেক্ষার সময় চলে গেছে। একটা কিছু করা দরকার—করা দরকার এর একটা অনিবার্য প্রতীকার। আমাদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বিক্রম

শেষ পর্যন্ত ট্রফিটা জিতে নিয়ে যাবে, এ অপমান কিছুতেই বরদাস্ত করব না আমরা।

চায়ের পেয়ালাটা রেখে আমি উঠে পড়লাম। বললাম, আসছি।

খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত বিক্রমকে পেলাম লাইব্রেরীতে। দেখি, অত্যন্ত অভিনিবেশ-সহকারে দাগ দিয়ে দিয়ে কী একটা বই পড়ে চলেছে সে। ভালো করে লক্ষ্য কবে দেখলাম, 'কল্পনা'। বিড় বিড় করে পড়তে পড়তে সযত্নে দাগ দিয়ে যাচ্ছে ঃ

"কী কথা ওঠে মর্মরিয়া বকুল-তরু-পল্লবে
ভ্রমর ওঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা,
উর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে—"

অকারণে পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে উঠল আমার। ডাকলাম, বিক্রম ?

বিক্রম চমকে উঠল, হাতের পেন্‌সিলটা কেঁপে উঠে একটা এলোমেলো রেখা ফেলে দিলে বইটার ওপর। বললে, কে, সুকুমাব ?

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

বিক্রম পাশের ডেস্‌ক্‌টা দেখিয়ে দিয়ে বললে, বেশ, বোসো।

আমি বসলাম। কিন্তু চুপ করেই নেহাৎ বসে রইলাম খানিকক্ষণ। মনের মধ্যে তীব্র আগুনের মতো কী একটা

জ্বলে যাচ্ছে আমার। ঠিক কোন্‌খান দিয়ে যে কথা আরম্ভ করব ভেবে পাচ্ছি না।

বিক্রম বই বন্ধ করে বললে, কী কথা ?

বুকের ভেতর ফুলে ওঠা উত্তেজনাটাকে সংযত করে নিয়ে আমি বললাম, একটা জিনিস জিজ্ঞাসা কবতে চাই। আশা করি উত্তরটা তুমি দেবে।

—স্বচ্ছন্দে। —বিক্রম প্রসন্ন অথচ কোমল লজ্জিত হাসি হাসল। বললে, অমন করে আই. বি.র মতো ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করছ কেন ? কী বলতে চাও বলো না।

স্পষ্ট বোঝাপড়া করতেই যখন এসেছি, তখন 'হিউমার'কে মেনে নেওয়ার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। তবু চট্‌ করে কথাটা পাড়বার আগে একটু দ্বিধা করলাম আমি ঃ তুমি আজকাল মণিকা সেনের সঙ্গে খুব মেশামেশি করো দেখতে পাই।

—তা মিশি বটে—তেমনি সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসিতে বিক্রম উত্তর দিলে।

—এত ঘনিষ্ঠতা হল কী করে জানতে পারি ?—আমার স্বরের আপত্তিকর ভঙ্গিটা আমার নিজেরই কানে ঠেকল।

ভেবেছিলাম, বিক্রম আমার প্রশ্ন করবার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করবে ; কিন্তু করল না। বরং তেমনি স্বাভাবিক ভাবে বললে, আমিই করে নিয়েছি।

—কেন ?—উত্তেজনায় আমার কান দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল।

—ওঁর কাছে রবীন্দ্র-কাব্য পড়ি আমি।

—ওঃ—ব্যঙ্গভরে আমি বললাম, তাই 'কল্পনা' থেকে বুঝি ইম্পরট্যান্ট্ এক্সপ্ল্যানেশনগুলো দাগিয়ে নিচ্ছ?

—অনেকটা তাই—বিক্রম হাসল। তেমনি প্রশান্ত মুখেই। বললে, এক্সপ্ল্যানেটরী পিস্ হিসাবে 'কল্পনা'র কবিতাগুলো নেহাৎ মন্দ জিনিস নয়। তোমার আপত্তি আছে কিছু?

—একটু আছে বই-কি। রবীন্দ্র-কাব্য পড়াবার আর কি লোক তুমি খুঁজে পেলে না?

—কই আর পেলাম!—বিক্রমের মুখে হাসির সঙ্গে সঙ্গে বেদনারও ছায়া পড়ল একটা: তোমাদের কাছে তো আমলই পাই না—আমাব শবীর আর ব্রেনকে তোমবা সমান স্থূল ঠাউবে নিয়ে বসে আছো। দেখলাম, উইথ্ হার ফেমিনিন ইন্স্টিংকট্—উনি তোমাদের এই অব্সেসন থেকে মুক্ত। আই য়্যাম্ বিয়ালি গ্রেট্ফুল টু হার। তা ছাড়া উনি ইণ্টাবমিডিয়েটে ৱাংলায় ফার্স্ট হয়েছিলেন ইউনিভার্সিটিতে। সেটাও ভেবে দেখেছি।

—হুঁ!—মণিকা সম্পর্কে বিক্রমের সস্নেহ বলার ভঙ্গিতে অসহ্য ক্রোধে খানিকক্ষণ কথাই বেরুল না আমার: কিন্তু ভালো হচ্ছে কি কাজটা?

—কেন, অন্যায়টা কোথায়?

—এ জাতীয় মেলামেশা কি খুব ভালো? বিশেষ করে একজন লেডী-ক্লাসফ্রেণ্ডের সঙ্গে?

প্রশান্ত হাসিতে বিক্রম বললে, অবশ্য ইচ্ছে করলে নোংরা ব্যাখ্যাও করতে পারো তোমরা। আর সুবিধে পেলেই সে সুযোগ নিতে তোমরা ছাড়বে না, তাও আমার জানা আছে।

—কী বললে!

—সত্যি কথাই বললাম—বিক্রমের চোখে দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে উঠল : সহপাঠিনীদের সঙ্গে মিশলে তোমাদের মন ছোট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার হয় না। এর মধ্যেই ফণী এ নিয়ে কতগুলো বিশ্রী কথা বলে বেড়িয়েছে সে আমি জানি। সে যাক—হঠাৎ পাঁচ হাতের চাইতেও বেশি লম্বা রাজপুত মেরুদণ্ড টান করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো : একটা কথা ওকে বলে দিয়ো সুকুমার। ক্যারাভান যখন যায় তখন যতই কুকুর ডাকুক, কিছুই আসে যায় না তার। লাভের মধ্যে কুকুরেরই খানিকটা এনার্জি নষ্ট হয়—যেটা সে অন্য সৎকাজে খরচ করতে পারত।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে গেলাম আমি। এ সে বিক্রম নয় যে চোরের মত চুপিচুপি আমার কাছে কবিতা দিতে এসেছিল। এ বিক্রম চোখের সামনে ওভার-বাউণ্ডারী করে গট্‌-গট্‌ করে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে চলে গেল—আমি একটা কথা বলতে পারলাম না আর। তাকিয়ে দেখলাম, স্কোর বোর্ডে একটা অবিশ্বাস্য অঙ্কপাত হয়েছে, যার কাছেও আমি কোনো দিন যেতে পারব না।

শুধু আমার দুটো চোখ অন্ধ বিদ্বেষে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল।

কিন্তু তবু আনাড়ীর ব্যাটিং। আমরা যারা পাকা ফিল্ড্স্-ম্যান, তারা অপেক্ষা করতে লাগলাম উপযুক্ত অবকাশের। এখন স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের মধ্যে। এ অসহ্য—এ অবিশ্বাস্য। ক্লাশে আমাদের মতো দুর্দান্ত সব ছাত্র থাকতে কলেজের সেরা মেয়েকে এমনি করে বশীভূত করে নেবে একটা মাথামোটা অবাঙালি! এ আমাদের সকলের অপমান—এ জাতীয় অপমান। ফণী সত্যেন দত্ত আবৃত্তি করে বললে:

এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি,
মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-কেদারের প্রতাপে হটিতে
হয়েছে দিল্লীনাথে।

এবার সিগারেটের অগ্নিশিখা জ্বেলেই সোজা রাজপুতকেও একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলব! হুঁ-হুঁ, চালাকি নয়।

দূর থেকে চোখা চোখা বাক্যবাণ ছুঁড়তে শুরু করলাম আমরা, কাব্যচর্চা চলতে লাগল ব্ল্যাক-বোর্ডে। কিন্তু আশ্চর্য নিবাসক্ত বিক্রম—অদ্ভুত রকমে নির্বিকার। ক্যারাভান সত্যি সত্যিই এগিয়ে যাচ্ছে, হাজার চেষ্টা করেও আমরা তার গতিরোধ করতে পারছি না। বাস্তবিক, আমাদেরই এনার্জির অহেতুক অপব্যবহার হচ্ছে দিনেব পর দিন।

আর ফণী আনছে একটার পর একটা মর্মঘাতী খবর।

—পরশু ওরা আবার চা খেয়েছে।

—কাল বিক্রম ওদের লনে টেনিস খেলছিল।

—আজ সন্ধ্যার পরে বেল্‌স্‌-পার্কে দুজনে পাশাপাশি বেড়াচ্ছিল। সে কী ইন্টিমেট্‌ ভঙ্গি। বুঝলে সুকুমার, something is happening !

উঃ, অসহ্য করে তুলল।

ইচ্ছে করে, মণিকার কাছে যাই, সমবেত ভাবে বাঙালি জাতির তরফ থেকে তার সুমতি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি আমরা। কিন্তু সাহস হয় না, অত্যন্ত রাশভারী মেয়ে, মুখের ওপর যা-তা বলে দিলে অপমান রাখবার জায়গা থাকবে না। আর তারপর একটিমাত্র পার্লামেণ্টারি রাস্তা খোলা থাকবে, সে হল আত্মহত্যা। নাঃ, ও রিস্‌ক্‌ নেওয়া যায় না।

কিন্তু কী করা যায়? দল বেঁধে বসে আমরা সিগারেটের পর সিগারেট ওড়াতে লাগলাম, আর প্রোগ্রাম করতে লাগলাম —কী করা যায়! সমস্ত বাঙালি জাতির মুখ যে কলঙ্কিত হয়ে গেল! আবার বুঝি বিক্রমজিতের ছদ্মবেশ ধরে মুহম্মদ বিন্‌ কাশিমের আবির্ভাব হয়েছে বাঙালির ইতিহাসে!

অবশেষে এল সুযোগ। শুধু সুযোগ নয়, ক্লিন্‌ বোল্‌ড-আউট করে দিলাম বিক্রমকে, উড়িয়ে দিলাম তার উইকেট।

ব্যাপারটা ঘটল কলেজ সোস্যালের সময়।

পর পর তিনখানা গান গেয়ে আমি যখন মাইক ছাড়লাম তখন সমস্ত হলটা প্রচণ্ড হাততালিতে মুখরিত হচ্ছে। সমস্বরে কয়েক জন চিৎকার করে উঠল 'এন্‌কোর, এন্‌কোর'—কিন্তু আর

গাইলাম না আমি। খাঁটি শিল্পীর মত্যেই হাত জোড় করে একটা প্রসন্ন নমস্কার জানিয়ে নেমে গেলাম 'ডায়াস' থেকে।

তখন চারদিকে ছেলে-মেয়ে এবং অধ্যাপকদের দৃষ্টি আমার ওপরেই নিবদ্ধ হয়ে আছে। গর্ব করব না, কিন্তু এ কথা সত্যি গানটা ভালোই গাই আমি। আজ আরো প্রাণ ঢেলেই গেয়েছি। গাইতে গাইতে এও লক্ষ্য করেছি, মুগ্ধ বিস্ময়ে মণিকা সেন আমার মুখের দিকে আগাগোড়াই তাকিয়ে ছিল। আজ আমার নতুন একটা পরিচয় আবিষ্কার করেছে সে। আজ তার কাছে আমিই 'হিরো'।

সমস্ত হলটাতে রচনা করে দিয়েছিলাম সুরের ইন্দ্রজাল। তখনো চারিদিকে তার রেশ কাঁপছে রিন-রিন করে—তখনো তার আবেশ ছড়িয়ে আছে সকলের বিমুগ্ধ চেতনার ওপরে। অসীম আত্মপ্রসাদে মণিকার দিকে তাকালাম আমি—দৃষ্টি মিলতেই সসংকোচে চোখ নামিয়ে নিলে সে।

এই সময় ফণী হঠাৎ মাইকে দাঁড়িয়ে উঠল। সোস্যাল সেক্রেটারী সে।

ফণী বললে, যদিও প্রোগ্রামে নেই, তবু আজ আপনাদের একটা নতুন 'ফিচার' উপহার দেব আমরা। আপনারা জানেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালিরই নিজস্ব সম্পদ নন—তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের অন্তরের ধন। 'পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা' সবাই তাঁকে লাভ করে ধন্য। তারই প্রমাণ স্বরূপ

আমাদের অবাঙালি বন্ধু বিক্রমজিৎ সিংহ আপনাদের দু-একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে তৃপ্তিদান করিবেন।

ক্রিকেট ম্যাচের স্মৃতি ছাত্রদের মনের কাছে তখনো পুরোনো হয়নি। একটা নতুন সকৌতুক বিস্ময়ের প্রত্যাশায় আবার প্রচণ্ড হাততালিতে হল কাঁপতে লাগল।

বিক্রম সামনের একখানি চেয়ারেই বসে ছিল। তৃপ্ত চোখে আমরা দেখলাম, মুহূর্তে তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বিনা ভূমিকম্পেই যেন তার মাথার উপরে ভেঙে পড়েছে ছাতটা।

ফণী ডাক দিলে, এসো বিক্রম—

বিক্রম দাঁড়িয়ে উঠে সভয়ে বলতে চেষ্টা করল : না না—

ফণী তাকে শেষ করতে দিলে না। আবার উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করলে : আমাদের বন্ধুটি নীরব সাধক। তিনি আত্মপ্রকাশে লজ্জা পাচ্ছেন। কিন্তু আমরা জানি, তিনি সত্যিকারের গুণী—একেবারে আদর্শ নীরব কর্মী। তিনি ধরা দেন না, তাঁকে আবিষ্কার করে নিতে হয়। ক্রিকেটের মাঠে একদিন তাঁর বিস্ময়কর আবির্ভাবের কথা হয়তো এর মধ্যেই আপনারা ভুলে যাননি। আমি জোর করে বলতে পারি, আজ তাঁর প্রতিভার আরো একটা আশ্চর্য দিক্ আপনাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হবে। এসো বিক্রম—পরম আদরে ফণী হাত বাড়িয়ে দিলে।

প্রবল জয়ধ্বনি উঠল।

বিক্রম পালাতে চাইছিল, কিন্তু পারল না। ক্যাপটেন ব্যানার্জি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল—যেমন করে তাকে খেলার মাঠে

টেনে নামিয়েছিল, ঠিক তেমনি করেই টেনে তুলল ডায়াসের ওপরে। বললে, চিয়ার আপ্—

জলে-ডোবা মানুষের মতো একবার চারদিকে তাকালো বিক্রম।

আমরা সমস্বরে বললাম, না, না, লজ্জা করলে চলবে না—

বিক্রম তখন থর-থর করে কাঁপছে। যখন টানাটানি করে তাকে হার্মোনিয়ামের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল, তখন তার মুখের চেহারাটা শুধু যে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, তাই নয়, একটা অবর্ণনীয় পাণ্ডুরতায় যেন শবের মতোই দেখাচ্ছে তাকে। যেন কশাইখানার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্য পশুকে।

পরক্ষণেই চোখ বুজে বল পিটোনোর মত মরীয়া হয়ে হার্মোনিয়াম ধরলে বিক্রম।

কিন্তু গান আর ক্রিকেটের বল এক নয়। কর্কশ বেসুরো গলায় দু-একটি লাইন ধরতে না ধরতেই হাসি এবং হাততালির বন্যা ডেকে গেল। পেছন থেকে উঠল এক দল শেয়াল-কুকুরের সম্মিলিত ঐকতান। আগের থেকেই বন্দোবস্ত ছিল ফণীর, নক্ষত্রবেগে দু-তিনটে ডিম আর পচা টোম্যাটো এসে পড়ল বিক্রমের গায়ে।

ঘরময় হিংস্র আর নিষ্ঠুর হাসির প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। গানটা শেষ করে নয়, একটা আর্তনাদ করে যেন উঠে দাঁড়ালো বিক্রম। আর কোনো দিকে তার লক্ষ্য পড়ল না, আর কেনো অপমান যেন তাকে স্পর্শও করল না। আকুল চোখ মেলে সে মণিকা

সেনকেই খুঁজতে লাগল। এবং যথানিয়মে তাকিয়ে দেখল, মুখে রঙিন রুমাল চেপে হাসির আবেগে যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে মণিকা সেন।

আব কেউ দেখল না, কিন্তু আমি দেখলাম। দেখলাম, বিক্রমের দু চোখের কোণায় বজ্র আর বৃষ্টি একসঙ্গে চক-চক করছে। কিন্তু মনের মধ্যে নাচছে প্রতিহিংসার জল্লাদ, সহানুভূতি জোর বাঁধল না। অনেক চেষ্টা করেই আমি ঘরভরা পৈশাচিক অট্টহাসিতে যোগ দিলাম।

ডায়াস থেকে নেমে পড়ল বিক্রম। আর একটা পচা টোম্যাটো এসে ঠিকরে পড়ল ওর মুখে, বীভৎস ভাবে বাঙিয়ে দিলে ওকে। হাসি এবং জন্তুর ডাকে যেন প্রলয় চলতে লাগল চারদিকে। একটা আদিম বন্যতা সমস্ত শৃঙ্খল আর শৃঙ্খলার বাঁধন থেকে মুক্তি পেল, যেন আফ্রিকার অরণ্যের এক দল নরখাদক তাদের শিকারকে ঘিরে ধরে শুরু করেছে দানবীয় কোলাহল !

হঠাৎ বিক্রম চেঁচিয়ে উঠল ঃ কাউয়ার্ডস্ !—কিন্তু কান্নাভরা গলায় হুঙ্কাব ওর ফুটল না, অসহায় আকুলতায় হাবিয়ে গে'ল।

দরজার দিকে ছুটে পালিয়ে গেল বিক্রম। মণিকা সেনের মুখে তখনো রুমাল চাপা, উচ্ছ্বসিত প্রচণ্ড হাসিটা কোনো মতেই রোধ করতে পারছে না সে।

হলের গণ্ডগোল থামাবার জন্যে আমাকেই আবার গিয়ে মাইকে বসতে হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গানের যাদুমন্ত্র বিস্তার

করে চারদিক নিস্তব্ধ করে দিলাম আমি। আহত একটা কুকুরের মতো যখন নিজের কোনো একটা নিভৃত কন্দরে লুকিয়ে ক্ষত লেহন করছে বিক্রম, সেই অবসরে মণিকার দৃষ্টির প্রসাদ আমার ওপর এসে পড়ল বরমাল্যের মতো। আজ আমারই জয়-জয়কার!

একটা শ্লিপ পেলাম সোস্যাল শেষ হওয়ার পরেই।

মণিকা সেনের শ্লিপ। এক টুকরো সুগন্ধি কাগজে মুক্তোর মতো লেখা :

"কাল যদি দয়া করে আমাদের বাড়িতে চা খান, খুশি হবো। বিকেল পাঁচটায় আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করব আমরা।"

শ্লিপটা ভাঁজ করে বুক-পকেটে রাখলাল আমি, রাখলাম বুকের কাছাকাছি। বিক্রমের অভিনয় শেষ হল, এবার রঙ্গমঞ্চে আমি প্রবেশ করলাম নায়করূপে।

*   *   *   *

বছর ছয়েক পরের কথা।

এম. এ. পাশ করে অধ্যাপনা নিয়েছি পশ্চিমের কোনো বড় শহরে। বাসা পেয়েছি কলেজের কাছাকাছি—বেশ খোলা-মেলা জায়গায়। সস্ত্রীক আছি—অল্প আয়েও দুজনের মোটামুটি সচ্ছল ভাবেই চলে যায়—গুছিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে গৃহিণীর।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, কলেজ থেকে ফিরে আর বেরুইনি আমি। অনার্স ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীরা তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো আকুল হয়ে আছে, তাদের জন্যে কিছু নোট তৈরি করা প্রয়োজন। মোটা-মোটা একরাশ বই খুলে নিয়ে লিখে চলেছি আমি, আর মধ্যে মধ্যে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখছি বৃষ্টির ঝরনায় ঝাপ্‌সা হয়ে আসা ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় বাইরের ঝাউবীথি কী অশান্ত ভাবে মাতামাতি করে চলেছে।

খট। কল্যাণী ঘরে ঢুকল। ওদিকের টিপয়ের ওপরে রাখা রেডিয়োটাকে খুলে দিয়েছে। কাঁটা ঘুরিয়ে কলিকাতা স্টেশন ধরল। গান বেজে উঠল ঃ "বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারি এ দ্বারে—"

কলম নামিয়ে রেখে আমি হাসলাম ঃ দিলে তো লেখাটা মাটি করে?

কল্যাণী পাশে এসে বলল ঃ রাখো ও-সব লেখা। যা তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের নমুনা—নোট দিলেও ফেল করবে, না দিলেও করবে। মিথ্যেই পণ্ডশ্রম করে মরছ তুমি।

—কিন্তু তুমিও তো আমারই অনার্সের ছাত্রী ছিলে।

—তাই জন্যেই তো শেষ পর্যন্ত পাশ করবার জন্যে তোমাকে বিয়ে করতে হল।—কল্যাণী হাসল।

—না, লক্ষ্মীটি! দুষ্টুমি করে না এখন, লিখতে দাও—আমি বললাম, অনার্সের ব্যাপার। ওরা ফেল করলে কি আর মান থাকবে!

বললাম বটে, কিন্তু লেখায় আর মন বসল না। কত দিনের পুরোনো গান, কত পরিচিত। এক কালে কত বর্ষার সন্ধ্যায় এই গান গেয়ে আসরে ছড়িয়ে দিয়েছি মধুমদি স্বপ্ন। বরিশাল কলেজের সেই দিনগুলো স্মৃতির মধ্যে হঠাৎ গুঞ্জন করে উঠল। 'শকুন্তলা'-র সেই শ্লোকটা মনে পড়ল : "ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি"।

কিন্তু হঠাৎ ভেঙে গেল আবেশটা। সজোরে কড়া নড়ে উঠল বাইরের দরজায়।

কল্যাণী বিরক্ত হয়ে বললে, এখন আবার কে জ্বালাতে এল ?

—আবার কে ! নিশ্চয় রতনপ্রসাদ, ব্রীজ খেলার জন্যে ডাকতে এসেছে। হাঁক দিয়ে বললাম, এসো এসো পাণ্ডে, দরজা খোলাই রয়েছে।

কল্যাণী তেমনি বিরক্ত স্বরে বললে, না না, এই বৃষ্টির মধ্যে আর যেতে হবে না তাসের আড্ডায়। ভিজে অসুখ করবে শেষে।

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই শোনা গেল ভারী পায়ের শব্দ। দরজা খুলে গেল, আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল কল্যাণী।

কাঁধে ভিজে বর্ষাতি, মিলিটারী ইউনিফর্ম-পরা দীর্ঘদেহ পুরুষ। অতিকায় চেহারা, দেখলে আতঙ্ক জাগে। বাহুতে আর. আই. এ. এফ-এর চিহ্ন পদ-মর্যাদা দ্যোতনা করছে। দাঁড়ালো এসে একেবারে মূর্তিমান যমদূতের মতো।

যুদ্ধের সময়। মিলিটারীদের সম্পর্কে সমস্ত আতঙ্ককর জনশ্রুতিগুলো বিদ্যুৎবেগে ভেসে গেল স্মৃতির ওপর দিয়ে। সভয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি, বললাম, কী চাও ?

লোকটা নিঃশব্দে হাসল, জবাব দিলে না।

কোনো কুমতলব নেই তো ? আমি প্রায় চীৎকার করে উঠলাম ঃ কী চাও তুমি, কেন ঢুকেছ বাড়ির মধ্যে ?

সে তবু দাঁড়িয়েই রইল।

—প্লিজ, বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। নইলে পুলিশে ফোন করব আমি—আতঙ্কিত উত্তেজনায় আমার গলা কাঁপতে লাগল থর-থর করে।

লোকটা এবারে কথা বললে। বললে পরিষ্কার বাংলায়, শান্ত কোমল একটা মৃদু হাসির সঙ্গে ঃ আমি কি এতই বদলে গেছি গুপ্ত ? আমায় চিনতে পারছ না ?

আমি চিনলাম। চিনলাম অত-বড় বিরাট পুরুষের অমনি একটা স্নিগ্ধ মেয়েলি হাসি দেখে। বলে ফেললাম, বিক্রমজিৎ !

বিক্রম এগিয়ে এল। দুটো প্রকাণ্ড ভিজে হাতে আমার ডান হাতটা তুলে প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিলে, উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, সুকুমার !

কল্যাণী দাঁড়িয়েছিল বিবর্ণ মুখে, তখনো সম্পূর্ণ কেটে যায়নি তার বিহ্বলতাটা। তার দিকে ফিরে বিক্রম বললে, আগে চটপট এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করুন মিসেস গুপ্ত,

তার পর পরিচয় হবে। দেরি করবেন না, I am awfully tired!

হাসবার চেষ্টা তখনো হাসতে পারল না কল্যাণী। নিজের অপ্রতিভ অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্যই বোধ হয় বেরিয়ে গেল পরদা ঠেলে।

ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বিক্রম বললে, এখানকার এক বাঙালি পুলিশ অফিসারের কাছে তোমার খবর পেলাম। বেশ ভালোই আছো দেখছি।

চলে যাচ্ছে এক রকম করে। কিন্তু তুমি হঠাৎ এ ভাবে এলে কোত্থেকে?

সে সব কি আর এক কথায়ই বলা যায়? বিক্রম পাউচ থেকে তামাক নিয়ে পাইপে ভরতে লাগল: অনেক সময় লাগবে, অনেক কথা আছে। তার আগে একটু চা খেয়ে নিই—বড় ক্লান্ত আপাতত।

* * * *

চা আর খাবার গো-গ্রাসে শেষ করে বিক্রম বললে, মনে আছে বোধ হয় সেই সোস্যালের পরেই আমি কলেজ ছাড়ি—ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসি কলিকাতায়।

সসংকোচে বললাম, ও-কথা মনে করিয়ে আর লজ্জা দিয়ো না ভাই।

বিক্রম হেসে উঠল : আরে ছি ছি, এত দিন পরেও কি তুমি জিনিসটাকে সিরিয়াস্‌লি নিচ্ছ না কি! ওটা যৌবনের ধর্ম তার জীবন। অস্বীকার করব না, সেদিন খুব শক্‌ড্‌ হয়েছিলাম। কিন্তু আজ মনে পড়লেও হাসি পায়। তা ছাড়া, যুদ্ধে I have seen life through and through! সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্‌ আর নেই।

পাইপটাকে খুলে অ্যাশ্‌-ট্রের ওপর ঝাড়তে ঝাড়তে বিক্রম বললে, কিন্তু একটা সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্‌ আমার তখনো ছিল, আজো রয়েছে; অথবা তাকে সেণ্টিমেণ্ট বলব না—বলব ইন্‌স্‌পিরেশন। সে হল বাংলা দেশ সম্পর্কে আমার একটা অসীম অনুরাগ, সীমাহীন প্রীতি। আজ আর অবশ্য সে জন্যে আমার মণিকা সেনকে দরকার হয় না—রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের মূল সূত্রটি নিজের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি।

তবু আমার ভুল হয়েছিল। আমি নিজেকে ঠিক চিনতে পারিনি। ভুল হয়েছিল এই জন্যে যে স্বধর্ম হারিয়েছিলাম আমি। এক কালে লোকে ভাবত কোট-প্যাণ্ট না পরলে ইংরেজি শেখা যায় না, আমি ভেবেছিলাম, বাংলা কাব্য পড়তে বাঙালি হওয়া দরকার। আমি জানতাম না, কবিতার 'কালচার কোনো বিশেষ পটভূমিতে আবদ্ধ নয়, তা ফর অল প্লেসেস্‌ অ্যাণ্ড অল টাইম্‌স্‌!

ওই ভুলের জন্যেই আমি ঘা খেলাম, দুঃখ পেলাম জীবন। রাজপুত আর্টের দিক্‌টা দেখতে গিয়ে হারাতে চেষ্টা করলাম

রাজপুত জীবনকে। ফল যা হল তা অত্যন্ত বিয়োগান্ত। আমার একূল গেল, ওকূলও আমি খুঁজে পেলাম না।

আজ আর বলতে সংকোচ নেই—একটি বাঙালির মেয়েকে বিয়ে করবার স্বপ্নই আমার ছিল। ঘাগ্‌রাপরা বলিষ্ঠ দেহ কোনো মরুভূমির মেয়ে নয়, আমি চেয়েছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠের কৃষ্ণকলিকে। কিন্তু দেখলাম তা হবার নয়। বাঙালি মেয়েরা শ্রদ্ধা করল আমার শক্তিকে, আমার রাজপুত পৌরুষকে, আমার কবি মনকে নয়। অর্থাৎ চাইল আমার অবাঙালি সত্তাকে, আমার বাঙালিত্বকে অসীম কৌতুকে উড়িয়ে দিলে তারা। সোস্যালের দিনে মণিকা সেনের সেই তীব্র ভয়ঙ্কর হাসি আমার ভোলবার নয়।

কলকাতায় পড়তে আসার কিছুদিন পরের কথা।

বাবার এক বাঙালি বন্ধুর দৌলতে তাঁর অফিসে আমার একটা চাকরি জুটে গেল। শ' খানেক টাকা মাইনে। মনে হল, জীবনে চরম পাওয়া আমি পেয়ে গেছি—এর বেশি কিছু আর কিছু চাইবার নেই আমার। এমন কি, মণিকা সেনের স্মৃতি পর্যন্ত মন থেকে মুছে আসছিল একথা বললে অন্যায় হয় না।

তবু স্বপ্ন ছিল চোখে। তবু ভুলতে পারিনি শ্যামল মাটির শ্যামলা বাঙালি মেয়ের কথা। কিন্তু তারা শুধু ছোঁয়াই বুলিয়ে গেছে—ধরা দেয়নি কোনো দিন! নানা ভাবে দোলা দিয়ে গেছে, জাগিয়ে গেছে নেশা। বাধা এসেছে শেষ পর্যন্ত।

কখনো বাইরে থেকে, আবার কখনো নিজের মনের মধ্যেই তা সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে আপনা থেকে।

একটা ছোট ঘটনার কথাই বলি।

জানোই তো রাজপুত হলেও আমরা পুরোপুরি বাঙালি-ঘেঁষা! সত্যি কথা বলতে কি, আমি যে বাঙালি নই একথা প্রায়ই আমার মনে থাকত না। তার জন্যে কলকাতায়ও আমার বাঙালি পরিচিতের অভাব ছিল না। দু-একজনের সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়েছিল বললেও অন্যায় হয় না!

বলেছি তো একশো টাকা মাইনেতে চাকরি করতাম। সুখেই ছিলাম।

অতএব আর কিছুই করবার নেই। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। বাঁধা শড়কে, বাঁধা নিয়মে পা ফেলে এগিয়ে চলা—ব্যতিক্রম নেই কোথাও, ব্যত্যয় নেই কোনো কিছুর। নটা-পাঁচটার ঘড়ির কাঁটায় ঘুরছে নিয়ন্ত্রিত নির্ভুল দিন; অফিস যেতাম, নিয়মিত কলম পিষতাম, ছুটি-ছাটার দিন আড্ডা মারতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম ক্রমশ। বরিশালে আমার যে নিঃসঙ্গতা দেখেছিলে, সেটাও কেটে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

বেশ ছিল।

কিন্তু এক একটা দিন আসে। এক একটা আশ্চর্য দিন। জীবনচক্রের সঙ্গে রুটিনে মেলানো বাঁধা ছুটি নয়, একটা আকস্মিক ব্যাঙ্ক হলিডে। রেসের মাঠে পাঁচ টাকার বাজি জেতবার মতো কিংবা ক্রশ্-ওয়ার্ড পাজ্‌লে হঠাৎ পেয়ে যাওয়া তিন

টাকা সাড়ে ন আনার মত একটা ছুটি—ছেলেমানুষের মতো খুশি করে তোলে মনকে। অকারণে নিজেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বলে মনে হতে থাকে, মনে হয় অপ্রত্যাশিত একটা সম্পদ এসে পড়েছে মুঠোর মধ্যে : কী ভাবে তাকে ব্যয় করা যাবে, কী উপায়ে সার্থক করে তোলা যাবে তাকে, ভেবে যেন দিশে পাওয়া যায় না।

এমনি একটা দিন আমার বাঁধা পথটাকে অকারণে বাঁকিয়ে দিলে একটু ; বেলা নটায় ডালহাউসি স্কোয়ারে যাওয়ার পথে হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে একটা অচেনা গলিতে ঢুকে পড়বার মতো।

সকালে ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল জানলা দিয়ে আজকে দেখা যাচ্ছে নতুন একটা অপরিচিত আকাশকে ; বৃষ্টি-ধোয়া অপরূপ একটা পরিচ্ছন্নতা, একটা আশ্চর্য নীলিমা ; মেঘের ছোটো ছোটো টুকরোগুলো যেন ছুটির অহেতুক আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। ফুটপাথের ওপরে তারের জালে শিশু শিশু-গাছটার পাতাগুলো অতিরিক্ত সতেজ আর সবুজ—তাদের ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে পড়েছে সোনালী রোদ। পাশের বাড়ির কার্নিশে তিন-চারটে পায়রা চোখ বুজে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সকালের রোদে নিমগ্ন হয়ে গেছে। ওদিকের ছাদে একটি কিশোরী মেয়ের একখানা টুকটুকে মুখ আর একরাশি এলোচুল যেন এই প্রসন্ন উজ্জ্বল সকালটির সঙ্গে এক তারে আর এক স্বরে বাঁধা।

ভারী খুশি মনে বিছানা ছেড়ে উঠলাম আমি। চা খেলাম, দাড়ি কামালাম, তারপর কড়া ইস্ত্রির শার্ট আর ঘামে মলিন কলারওয়ালা কোটটাকে সরিয়ে রেখে পরলাম একটা সিল্‌কের পাঞ্জাবি আর পায়জামা, গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে নেমে এলাম রাস্তায়।

বাগবাজার স্ট্রীট দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি চৌমাথার দিকে। একবার বেল্‌গাছিয়ায় পূর্ণর ওখানে গিয়ে তাস খেলে আসা চলে, আড্ডা জমানো চলে হাতীবাগানের ফোটো-আর্টিস্ট 'কমন' মামার স্টুডিয়োতে। কোথায় যাওয়া যেতে পারে এবং কোথায় গেলে এই উপরি-পাওনার দিনটিকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যাবে এটা নিশ্চিত ভাবে স্থির করবার আগে মনে পড়ল কাঁটাপুকুরে একবার ভবানীর খোঁজ করলে মন্দ হয় না। এত কাছাকাছি থাকে অথচ বছরখানেকের মধ্যে দেখাই হয়নি ভবানীর সঙ্গে।

কথাটা মনে পড়তেই ভারী ভালো লাগল আমার। বড় ভালো মানুষ ভবানী। মেয়েদের ব্যাপারে ও আমার চাইতে বেশি বিব্রত হয়ে উঠে। কলেজ-জীবনে কো-এডুকেশন ক্লাশেও আমার মতোই নিষ্ঠুর ঘা খেয়েছিল একটা। তাই আমার সঙ্গে ভারী মত মেলে ওর। বন্ধুত্বও বেশ জমেছিল এক সময়ে—এই একটি মনস্তত্ত্বকেই উপলক্ষ্য করে।

দরজার কড়া নাড়লাম।

দরজা খুলে দিলে ভবানীর বোন পূর্ণিমা। আর সঙ্গে সঙ্গেই

যেন নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করলাম আমি। সেদিনকার ছোটো মেয়েটি এক বছরের ভেতরে দস্তুরমতো একটি তরুণী হয়ে উঠেছে—ভারী আশ্চর্য তো!

পূর্ণিমা, ওরফে নিমু কেমন চমকে উঠল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে, ওঃ আপনি! নিমুর চমকটা লক্ষ্য করে আমি হেসে উঠলাম: কেন, আমাকে আর কিছু ঠাউরেছিলে নাকি? অনেক দিন আসতে পারিনি—বড্ড ব্যস্ত ছিলাম। তা ভবানী কোথায়?

—দাদা?—নিমুর মুখের রঙটা বদলে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল: দাদা তো নেই বাড়িতে।

—বাড়িতে নেই!—মনটা নিরুৎসাহ হয়ে গেল: বেরিয়েছে বুঝি!

নিমু কথা বললে না। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। একটা বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিমুর মুখের ওপরে বুলিয়ে নিয়ে অগত্যা বললাম, তবে আর কী হবে, যাই। ভবানী এলে বোলো, আমি এসেছিলাম।

নিমু এবারেও জবাব দিলে না, কেমন বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল। ঠোঁট দুটো একটুখানি শিউরে উঠেই থেমে গেল, যেন কী একটা বলতে গিয়ে সামলে নিলে নিজেকে। তারপরে আবার আস্তে আস্তে তেমনি ভাবেই নাড়ল মাথাটা।

কেমন খটকা লাগল আমার, কেমন যেন মনে হল ঘুমভাঙা চোখ মেলে জানলা দিয়ে নীল নির্মল উজ্জ্বল দিনটি দেখেছিলাম

তার সঙ্গে এর সুর মিলছে না। একবার জিজ্ঞাসা করতে চাইলাম ব্যাপার কী, কিন্তু পরক্ষণেই মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, আচ্ছা, আসি আজ।

মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি এমন সময় পেছন থেকে ডাক এল, শুনুন!

থেমে দাঁড়িয়ে গেলাম। নিমু ডাকছে।

বিষণ্ণ ম্লান স্বরে নিমু বললে, মা আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান।

এটা অপ্রত্যাশিত। জিজ্ঞাসায় কপাল কুচকে বললাম, আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ, আপনার সঙ্গেই।

বেশ নতুন রকমের লাগল। ভবানীর সঙ্গে যথেষ্ট বন্ধুত্ব থাকলেও হয়তো বিদেশী বলেই ওদের অন্তঃপুরে ঢোকবার সুযোগ পাইনি কখনো। আর দাবীও করিনি সেটা। কিন্তু আজ হঠাৎ এই নিমন্ত্রণ—কেমন অদ্ভুত বোধ হল।

জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়েই নিমু বললে, ভেতরে আসুন।

কিন্তু ভিতরে পা দিতেই তীব্র একটা অস্বস্তি শরীরের ভিতর দিয়ে চমকে গেল। অভাব আর অস্বাস্থ্য যেন শ্বাসরোধকারী খানিকটা গ্যাসের মতো পাক খাচ্ছে সমস্ত বাড়িটাতে। ভবানীদের অবস্থা ভালো নয় এটা জানতাম, কিন্তু সে যে এত খারাপ তা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারিনি। বাইরের ঘরের মধ্যবিত্ত রূপটা নিম্নবিত্ত অন্তঃপুরকে কী বিভ্রান্তিকর একটা

প্রচ্ছদপট দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, ভাবতেও লোমকূপগুলো একসঙ্গে শির শির করে শিউরে উঠল আমার !

যে ঘরে নিমু আমাকে নিয়ে এল, সে ঘরটিতে এই আলোয়-ভরা প্রসন্ন উজ্জ্বল সকালটিও সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্নতায় স্তিমিত হয়ে আছে। উপরি-পাওয়া ছুটির দিনটি এখানে এসে রূপায়িত হয়েছে মৃত্যুবিবর্ণ শোকদিবসে। চুন-বালির আস্তরখসা নানা রঙে চিহ্নিত, নোংরা দেওয়ালগুলোর দিকে তাকানো চলে না। একটা পচা চিম্‌সে গন্ধ সমস্ত নাকমুখকে বিস্বাদ করে দিচ্ছে—ইঁদুর মরে পচতে শুরু করেছে কোথাও। ঘরের একটিমাত্র জানলা—ওদিকের বাড়ির নোনাধরা একটা দেওয়ালে অবরুদ্ধ ; জানলা আর দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গাটুকু আকীর্ণ হয়ে আছে পাহাড় প্রমাণ ছাইয়ে আর আবর্জনায়, সম্ভবত ওখানেই স্বর্গীয় হয়েছে ইঁদুরটা। ঘরে তক্তোপোশ নেই ; মেজেতে ময়লা বিছানা, দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে রঙচটা গোটাকয়েক ট্রাঙ্ক, লক্ষ্মীর আসন, নিম্নবিত্তের গৃহস্থালীর সরঞ্জাম।

গরমে আর দুর্গন্ধে যেন দম আটকে আসতে লাগল, সর্বাঙ্গে দরদর করে ঘামের স্রোত নামতে লাগল ময়লা বিছানাটার দিকে তাকিয়ে। একটা ছেঁড়া শাল বুক পর্যন্ত টেনে ভবানীর মা শুয়ে আছেন। ব্যাধি। এই ঘরের সঙ্গে এমনি একটা অসুস্থতা না থাকলে সমস্ত জিনিসটাই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এবং আমার অবচেতন মন আশা করতে লাগল ব্যাধিটা যক্ষ্মা হওয়াই উচিত।

কিন্তু হাঁপানি। কামারশালার ইঁদুরে-কাটা পুরোনো হাপরের মতো শব্দ করতে করতে ফ্যাসফেসে গলায় ভবানীর মা বললেন, এসো, বোসো বাবা।

এদিক ওদিকে বিপন্নের মতো তাকালাম আমি—বসবার একটা জায়গাই খুঁজতে লাগলাম কিছু ক্ষণ। তারপর ধপ করে মরীয়া হয়ে মেঝের ওপরেই বসে পড়লাম !

মা বললেন, আহা হা, মেঝেতে বসলে কেন ? এই বিছানায় উঠে বসো।

—দরকার নেই, বেশ বসেছি এখানে।

পচা ইঁদুরের গন্ধ নাকের ভিতরে টানতে লাগলাম : এই অন্ধকার অবরুদ্ধ ঘরে লক্ষ কোটি ব্যাক্‌টিরিয়ার অনিবার্য সঞ্চার কল্পনা করে গায়ের চামড়াগুলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে আসতে লাগল আমার। কিন্তু চোখ বুজে একটা ভাঙা কুয়োর ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো এখন বেপরোয়া হয়ে গেছি আমি—যা হওয়ার তাই হোক।

তারপর সেই ভাবে বসে বসে আমাকে শুনতে হল ভবানীর মার দুঃখের কাহিনী। বক্তব্যের আসল তাৎপর্য—আজ আট মাস থেকে ভবানী নিরুদ্দেশ।

হাঁপানির ফ্যাস্‌ফেসে আওয়াজের সঙ্গে গোঙানি মিশিয়ে ভবানীর মা বলে যেতে লাগলেন : কলেজ থেকে বেরুবার পর চাকরি বাকরি তো জোটাতে পারল না ভবানী। দু-তিনটে টিউশনি করত, তারও তো কোনো বাঁধা আয়-পত্তর

কিছু নেই। বোঝোই তো বাবা, অভাবের সংসার—দুটো চারটে কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে। তাই বলে বাড়ি থেকে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবি! দুটো পয়সা পাঠানো তো দূরের কথা, একটা খবরও কি দিতে নেই! এদিকে আমি রুগী মানুষ, জাহাজের মতো এতবড় সংসারটাকে চালাই কী করে? আঠারো উনিশ বছরের ওই ছোট ভাইটা, পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পায়, তাতে এক হপ্তা চালনা। এতবড় আইবুড়ো বোন—সবশুদ্ধ কি আমি গলায় দড়ি দেব, না গঙ্গার জলে ডুবে মরব?

কথার শেষে ভবানীর মা কাঁদতে শুরু করলেন, দুটো জলের রেখা কালি-পড়া চোখের কোল বেয়ে চোয়ালভাঙা পাণ্ডুর গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ময়লা বালিশে। আমার সিনিসিজ্‌ম্ ক্ষমা কোরো সুকুমার। সহানুভূতিতে মন ভরে উঠল না আমার, বেদনায় প্রাণটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল না—শুধু মনে হতে লাগল পচা ইঁদুরের গন্ধটার মতো অস্বস্তিকর নারকীয়তার অনুভূতিটাই আবিষ্ট করে রেখেছে আমাকে। পেছন থেকেও যেন চাপা কান্নার একটা আওয়াজ আসছে, মুখ না ফিরিয়েও বুঝতে পারছি প্রায়ান্ধকারে ছায়ার মতো নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে আছে কিশোরী মেয়ে নিমু—যার ভাল নাম পূর্ণিমা।

উপসংহারে ভবানীর মা বললেন, তুমি তো তার বন্ধু বাবা—যেখান থেকে পারো ভবানীর একটা খবর এনে দাও।

—চেষ্টা করব, আপনি ভাববেন না।—উঠে পড়লাম।

দরজার বাইরে যখন পা দিলাম, তখন চোখে পড়ল কপাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে নিমু। তার বিষণ্ণ নির্বাক মুখের ডৌলটিতে, তার চোখ থেকে অশ্রুর কণার মতো মিনতি এসে যেন আছড়ে পড়ছে আমার সর্বাঙ্গে। চকিতের মধ্যে আমার চাপা পড়া কল্পনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যেন বর্ষার জল পড়ে হঠাৎ পাথুরে মাটির আড়াল থেকে মাথা তুলল একটি শ্যামল অংকুর। মনে পড়ল ঃ বাংলা দেশের কোনো বেণু-বন-ছায়া-ঘন-সন্ধ্যায় ওই মেয়েটিকেই আমি দেখেছি গাগরী ভরতে, মনে পড়ল, ওকেই আমি দেখেছি কালো চুলে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী পরে নাগকেশর বনের মধ্য দিয়ে পথ চলতে। আচমকা, একটা আকস্মিক মুহূর্তে যেমন হয়, নিমুকে অত্যন্ত ভালো লাগল আমার, মনের ভেতরে গুন্‌গুন্‌ করে কে বলে উঠল, ওর নাম পূর্ণিমা।

কিন্তু আর দাঁড়ালাম না আমি।

হাসছ সুকুমার ? কিন্তু জানো তো, কী রোমান্টিক ছিলাম আমি একদিন। সেই অমনোনীত কবিতাগুলোর কথা মনে আছে তো ? বিক্রমও হাসল।

বললাম, মনে আছে। কিন্তু আমি হাসতে পারলাম না, গোপন মনের অপরাধবোধটা আমাকে আঘাত করল।

বিক্রম পাইপটা নামিয়ে রেখে বলল, সেই রোমান্সের আলোয় মন আমার তখনো রঙিন। আর একবার তারই মূল্য দিলাম।

বৃষ্টি-ধোয়া একটা চমৎকার সকাল, ক্রস্‌-ওয়ার্ড পাজ্‌লে

তিনটাকা সাড়ে ন আনা পেয়ে যাওয়ার মতো একটা ছুটির দিন। এই অপরূপ সকালটিকে হারিয়ে ফেলে একটা অন্ধকূপে আত্মহত্যা করতে বসেছিলাম নাকি। মাথার ওপরে খোলা আকাশ, রোদে ঝলমলিয়ে ওঠা শিশুগাছটার কচি-কোমল পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে বুক ভরে একটা নিশ্বাস টেনে নিলাম।

অত্যন্ত দ্রুতবেগে পালিয়ে যেতে চাইছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কাঁটাপুকুর লেনের এই অন্ধকার একতলা বাড়িটার কথা। পচা ইঁদুরের গন্ধটা এখনো যেন স্নায়ুগুলোর উপরে চেপে বসে আছে। বাইরে এত বিস্তীর্ণ —এমন একটা পরিপূর্ণ জীবন থাকতে কেমন করে আমি ওই অন্ধকার মৃত্যুর গর্তটার ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম?

জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করেছি এতক্ষণে। এবেলা আর বেলগাছিয়ায় পূর্ণর ওখানে যাওয়া যাবে না, তবে হাতী-বাগানে মামার স্টুডিয়োতে আড্ডা জমান যেতে পারে এখনো।

আর ঠিক সেই সময় এমনি অঘটনটা ঘটে গেল।

হঠাৎ পাওয়া একটি ছুটির দিন! পূজো-পার্বণ নয়, তবু ছুটি; দশটা বাজে, তবু কড়া ইস্ত্রীর শার্টের ওপর কোট চাপিয়ে অফিসের দিকে ছুটতে হচ্ছে না আমাকে, ঝুলতে হচ্ছে না ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্রামে। বাগবাজার স্ট্রীট দিয়ে নির্বিকারভাবে লক্ষ্যহীনের মতো পথ চলেছি আমি। সব কিছু ব্যতিক্রম—সব কিছু আলাদা। আর ব্যতিক্রমের দিন বলেই কি মনের ভেতরেও এই ব্যতিক্রমটা ঘটল আমারও?

জানো সুকুমার, আশ্চর্য, চলার বেগটা আমার কমে আসতে লাগল আস্তে আস্তে। তারও পরে এক সময় ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি।

মন্দ কী। মন বললে, মন্দ কী, এই তো বেশ। আজকের এই আশ্চর্য নতুন সকাল একটা নতুন কিছুর দিকেই আমাকে টেনে নিয়ে যাক না। পূর্ণর ওখানে গিয়ে ব্রীজ খেলা—সে তো আছেই, যে-কোনো একটা ছুটির দিনের সঙ্গেই তো সেটা অঙ্গাঙ্গী। মামার আড্ডায় গিয়ে জমে-বসবার ভেতরও কোনো বৈচিত্র্য নেই—প্রতিদিনের বাঁধা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সেটা একাকার হয়ে গেছে। আজ একটা ভালো কিছু করব আমি—বৃহৎ একটা কিছু, মহৎ কোনো একটা প্রয়াস। হঠাৎ অতিরিক্ত সবুজ হয়ে ওঠা শিশুগাছের পাতাগুলোর মতো আকস্মিকতার রঙ লাগিয়ে নিজেকে নতুন করে তুলব!

—হ্যালো সিং!

পাড়ার চেনা চায়ের দোকান। জমে যাই মাঝে মাঝে। সেখান থেকেই ডাক দিয়ে নেমে এল গণেশ।

—আজ অফিস নেই বুঝি?

সংক্ষিপ্ত ছোট্ট জবাব দিলাম: নাঃ।

—দিব্যি আছেন। —গণেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। ভাবটা যেন আমি রোজই এই ধরনের ছুটি পাচ্ছি আর বাপের পয়সায় সিনেমা দেখে আর রেস্ খেলে বেড়ানো, গণেশের খাটতে খাটতে একেবারে প্রাণান্ত হয়ে গেল।

সংক্ষেপে বললাম, হুঁ।

—আজ একটায় ভালো বই আছে "শ্রী"তে—যাবেন? র‍্যাণ্ডম্ হারভেস্ট্। রোনাল্ড্ কোলম্যান যা একখানা প্লে করেছে—একেবারে চেটে খাওয়ার মতো। চলুন না।

—না।

—না কেন? খাসা ছুটির দিনটে আছে—

—আমার সময় হবে না—গণেশকে এড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলাম।

মন্দ কী—এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

চলতে চলতে মনে হতে লাগল, বাস্তবিক, এর কোনো অর্থ হয় না। তুমি বেশ আছো, নিশ্চিন্তে বেঁচে আছো তুমি। অফিস, চাকরি, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা, স্বাস্থ্য আর উৎসাহ—পরিতৃপ্ত সচ্ছল জীবনযাত্রা। কিন্তু ওইখানেই তো সব নয়! এতবড় পৃথিবী, এত মানুষ, এত দুঃখ। সকলের দুঃখ তুমি ঘোচাতে পারো না, দায়িত্ব নিতে পারো না পৃথিবীর সমস্ত মানুষের অভাব অভিযোগ মিটিয়ে দেবার। কিন্তু যতটুকু পারো ততটুকু কেন করবে না, কেন সাধ্যমতো তোমার দাক্ষিণ্যকে বিস্তীর্ণ করে দেবে না দুহাতে?

তা ছাড়া—তা ছাড়া ভবানী আমার বন্ধু। একেবারে অন্তরঙ্গ না হোক, সহপাঠী তো বটে। এক ধরনের হৃদ্যতাও তো ছিল। আজ এই অপূর্ব ছুটির দিনে—আশ্চর্যভাবে একটা বন্ধুকৃত্য করবার সুযোগ এসেছে আমার। মন্দ কী।

কেমন সুন্দর দৃষ্টিতে নিমু তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে। হঠাৎ অত্যন্ত ভালো লেগেছিল, হঠাৎ যেন চোখ পড়ে গিয়েছিল আসন্ন সন্ধ্যায় ধূপছায়া রঙ্ আকাশের প্রথম নক্ষত্রটির দিকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবার গুঞ্জরিত হল মনের মধ্যে। হঠাৎ যেন কে পদসঞ্চার করল আমার প্রাণের গভীরে। মনে হল :

"শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিনী
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিঃশ্বাস পরিমল—"

পূর্ণিমা নামটি ওর সার্থক—কিন্তু বর্ষার পূর্ণিমা। জলভরা মেঘের টুকরোতে যখন থেকে থেকে চাঁদের মুখ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

অতি প্রখর, অতি প্রগল্‌ভ জ্যোৎস্নার চাইতে বর্ষার পূর্ণিমাই ভালো।

চৌমাথায় এসে বড় একটা ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম দুটো দশটাকার, তিনটে এক টাকার নোট আর কয়েক আনা খুচরো পয়সা। এতেই বেশ কুলিয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

—আঙুরের সের কত করে ?

—চার টাকা।

—বেদানা ?

—তিন টাকা।

—খেজুর ?

—আড়াই টাকা।

কপালটা চুলকে নিলাম, মনে মনে একবার হিসাব করে নিয়েছি টাকার পরিমাণটা। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ চলে গেল আকাশের দিকে। জানলা দিয়ে যেমনটি দেখেছিলাম, ঠিক সেই রকম নীলিমোজ্জ্বল আকাশ; চৌমাথার নানামুখী ট্রামগুলোতে ঢং ঢং করে বাজছে ছুটির ঘণ্টা। রবীন্দ্রনাথের লাইন:

'নদীকূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে সখি ডেকে'—

আজ আর পকেটের হিসেব করলে চলবে না।

—সবগুলো দাও আধসের করে!

পেছন থেকে কে ঘাড়ে হাত দিলে। চকিতে মুখ ফেরালাম।

পূর্ণ। সারা মুখ ভর্তি করে একসঙ্গে বোধ হয় গোটা তিনেক পান খেয়েছে, পানের রস নিচের ঠোঁট থেকে গড়িয়ে নেমে পড়ছে চিবুক পর্যন্ত; এদিকে ঠোঁটের কোনে চুনের দাগ লেগে আছে। সবশুদ্ধ মিলিয়ে মস্তবড় একটা হাঁ করে হাসল পূর্ণ। ওর হাসিটা ওই রকম, একেবারে আল্‌জিভটা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ণকে একপলকে দেখেই অত্যন্ত বিশ্রী লাগল, ভারী ভাল্‌গার বোধ হল যেন।

পূর্ণ বললে, তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম।

—ওঃ!—নিরুৎসাহিত গলায় জবাব দিলাম।

—ভেবেছিলাম তোমাকে পাকড়াও করে নিয়ে একেবারে

দাক্ষিণেশ্বরে চলে যাব। দেখছি এখানে তোমার সঙ্গে দেখা না হলে বাড়ি গিয়েও তোমাকে পাওয়া যেত না। তা ব্যাপার কী? এত ফল কিনছ কী জন্য? কারো অসুখ নাকি?

—হুঁ।

—কার অসুখ?—পূর্ণ উদ্বিগ্ন হতে চেষ্টা করল।

মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম। সব জিনিস কেন এমন করে খুঁটিয়ে জানতে চায় পূর্ণ, কিসের জন্যে ওর এই অহেতুক কৌতূহল? আর দুর্ভাগ্যটা এম্‌নি যে, ঠিক সময় বুঝেই যেন মস্তবড় একটা হাঁ করে হতভাগা তার সামনে এসে দর্শন দিলে।

পূর্ণ আবার জিজ্ঞাসা করলে, কার অসুখ?

বিরক্তিতে মন ভরে গেছে। খানিকটা দ্বিধাও বোধ হল। তারপর পরিচ্ছন্ন গলায়, মন স্থির করে নেওয়ার নিশ্চত প্রত্যয়ে পরিষ্কার বললাম: কালীঘাটে আমার এক কাকা থাকেন, তাঁর। ফলের ঠোঙাটা আর দোকানীর দেওয়া ভাঙানিগুলো তুলে নিয়ে বললাম, খুব বেশি অসুখ। এসব ফল তাঁরই জন্যে।

পূর্ণর কৌতূহল তবু থামে না। যে মানুষগুলো মোটা হয়, বুদ্ধিও দিনের পর দিন তাদের ভোঁতা হয়ে আসে নাকি? গলার স্বরে আরো খানিকটা দুশ্চিন্তার খাদ মেশাতে চেষ্টা করলে পূর্ণ: তাই নাকি। তবে তো ভারী বিপদের কথা! অসুখটা কি হে?

ততক্ষণে একটা দ্রুতগামী সরীসৃপের মতো আমি পিছলে

পড়েছি সেখান থেকে। পূর্ণকে আর একটা কথাও বলবার সুযোগ না দিয়ে ধরে ফেলেছি চল্‌তি ট্রামের হাতল। পাদানিতে উঠতে উঠতে পেছন ফিরে বললাম, চললাম ভাই, আজ আর কথা কইবার সময় নেই।

পূর্ণ জিজ্ঞাসু একটা কাকের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঢন্ ঢন্ ঢন্। ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম চলেছে। প্রায় খালি ট্রামটার একেবারে সামনের সীটটাতে গিয়ে বসলাম। ভালো লাগছে—বড় বেশি ভালো লাগছে। কর্মহীন এই নিশ্চিন্ত দিনটাতে কী আশ্চর্য ভাবে কাজ জুটে গেল আমার। ওই একতলার অন্ধকার ঘর, পচা ইঁদুরের গন্ধ—মাঝখানে একটি দুঃস্থ পরিবার। মুহূর্তের মধ্যে একটা নতুন মূল্যে মূল্যবান হয়ে উঠেছি আমি, একটা আশ্চর্য কর্তৃত্ব, অপূর্ব একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে হাতের মধ্যে। এই পরিবারটির আমি উপকার করতে পারি, সাধ্যমতো তাদের অভাব মোচন করতে পারি, এই মুহূর্তে আমিই তো তাদের অভিভাবক। তুমি বলো সুকুমার, এমন একটা ছুটির সকালে এই কর্তৃত্বের লোভটা ছাড়তে পারি কি আমি, হারাতে পারি হঠাৎ-পাওয়া ছুটির মতো হঠাৎ-পাওয়া এই অধিকারকে ?

মন্দ কী—মন্দ কী ! নিজে বার বার কথাটাকে আওড়াতে লাগলাম। আমি সাধারণ, কত সাধারণ ! ক্রিকেটের মাঠের সেই অসাধারণত্ব কবে মিলিয়ে গেছে, সোশ্যালের দিনে মণিকা সেনের সেই হাসিতে ! বহুর ভেতর মিশে গিয়ে আলাদা

কোনো রূপ ছিল না আমার, নিজের কোনো রঙ্ ছিল না। আজ একটা বড় কিছু করবার উৎসাহে, মহৎ কোনো কিছুর অনুপ্রাণনায় স্বতন্ত্র হয়ে গেছি, অনন্য—একক হয়ে গেছি। আজকের দিনটি নিজের বাঁধা গণ্ডীটার বাইরে টেনে এনেছে আমাকে। বহুদিন পরে আবার চেতনার গভীরে বরিশালের স্মৃতি জেগে উঠল সুকুমার। একে হারাতে পারব না আজ। নিজের ভেতরে যেন স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

হেদোর সামনে এসে নামলাম ট্রাম থেকে।

শুনেছি, এলোপ্যাথিতে হাঁপানি সারে না, কবিরাজীই তার সব চাইতে ভালো চিকিৎসা।

এখানে বড় এক কবিরাজ আছেন—পুরোনো রোগ সারাতে তিনি নাকি সিদ্ধহস্ত। একবার তাঁর পরামর্শ নিলে মন্দ হয়না।

কবিরাজ বললেন, বলুন, কী চাই ?

—ভালো হাঁপানীর ওষুধ দিতে পারেন ?—উৎসাহের আকুলতায় রুদ্ধস্বরে আমি বললাম, টাকার জন্যে ভাববেন না, আমার ভালো ওষুধ দরকার।

এর পরে কাহিনীর সমাপ্তিটি অদ্ভুত। কিন্তু মোটেই নাটকীয় নয়। শুনে তুমি বরং নিরাশই হবে সুকুমার।

কাঁটাপুকুর লেনে যখন পা দিলাম বেলা তখন বারোটার ওপারে গড়িয়ে গেছে।

একহাতে ফলের ভারি ঠোঙাটা, আর একহাতে কবিরাজী

ওষুধ। উজ্জ্বল নির্মল সকাল দুপুরের ঝাঁঝাঁলো রোদ হয়ে জ্বলে যাচ্ছে কলকাতার ওপরে। শিশুগাছের বৃষ্টিধোয়া সবুজ পাতা-গুলোর ওপরে চল্‌তি গাড়ির ধুলো উড়ে পড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে একটা বিবর্ণ আস্তরণ।

ক্লান্ত পা ফেলে এগোচ্ছি। কিন্তু সমস্ত ক্লান্তি মনের ভেতরে যেন কোথায় একটা উজ্জ্বল আনন্দের ভেতরে হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পাওনা ছুটির দিনটি এমন হঠাৎ যে আমাকে এভাবে তাকে পরিপূর্ণ করে দেবে একি জানতাম সুকুমার?

আজ অধিকার পেয়েছি, সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছি একটা স্বাতন্ত্র্যে আর একাকিত্বে, একটা আশ্চর্য অনন্যতায়, যেমন একদিন হয়েছিলাম ক্রিকেটের মাঠে। এখন মনে পড়ছে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি ওদিকের ছাতে একটি কিশোরী মেয়ের একখানি সদ্য ফোটা মুখ, একরাশ ভিজে চুল পিঠ বেয়ে ভেঙে পড়েছে তার। প্রথম আলোয় উজ্জ্বল সে মুখখানি খুশিতে ভরা সকালটাতে একটুখানি সোনার রঙ্ ছুঁইয়ে দিয়েছিল—কিন্তু তখন কি জানতাম, ওই মুখখানার ভেতরে ব্যতিক্রম করা নতুন আলোর মতো আরো একটা ব্যতিক্রমের সংকেত রয়েছে?

সমস্ত পথটা নিজের ভেতরে বুনেছিলাম স্বপ্ন আর চিন্তার জাল। কী থেকে কী হয়ে যেতে পারে, কোথা থেকে কোথায় চলে যেতে পারি আমি। অভিভাবক হওয়ার সহজ আর সাবলীল হওয়ার এই দাবিটা শুধু কি ওইখানেই থেমে যাবে

আমার ? শুধু কিছু ফল, কিছু ওষুধ কিনে দিয়ে, কিছু পরিমাণে দানের দাক্ষিণ্য দেখিয়ে ?

বিদ্যুৎচমকের মতো মনে হয়েছে, বেশ বড় হয়ে উঠেছে নিমু—যার ভালো নাম পূর্ণিমা ! ভিজে ভিজে মেঘের আড়ালে আচ্ছন্ন বর্ষার পূর্ণিমা। হয়তো রূপ যথেষ্ট নেই পূর্ণিমার, কিন্তু লাবণ্য আছে, আছে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার অপরূপ স্নিগ্ধতা। আইবুড়ো মেয়ে—ভবানীর মা কাতরোক্তি করেছিলেন। স্বচ্ছন্দে, অত্যন্ত অবলীলাক্রমে পূর্ণিমাকে বিয়ে করতে পারি আমি। বিদেশী, কিন্তু যোগ্যতা তো আমার প্রচুর। আমি নিশ্চিত জানি, আমার দাবিকে ওরা সহজে ফিরিয়ে দিতে পারবে না—ভবানী তো খুশিই হবে। তাছাড়া যারা এত বিপন্ন, তারা কি অত বাছবে আর। দরিদ্র সংসারটির ভারমোচন করতে পারি, পারি বড় একটা কিছু—একটা কিছু মহৎ--

মন্দ কী ! মন বললে, এই ভালো।

উত্তেজিত আনন্দে কাঁপা হাতে দরজার কড়া নাড়লাম। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা অস্থির ভাবে দুলতে লাগল, পূর্ণিমা এসে এখনি দরজা খুলে দেবে।

কিন্তু পরক্ষণেই ভূত দেখার মতো তিন পা পিছিয়ে গেলাম। দরজা খুলে দিয়েছে ভবানী !

উজ্জ্বল হাসিতে ভবানী বললে, এসো, এসো ! তুমি আজই খবর নিয়েছিলে ওদের কাছে শুনলাম। এলাহাবাদে চলে

"গিয়েছিলাম ভাই—শ তিনেক টাকার একটা বড় চাকরি জুটিয়েছি ওখানে। তিন দিনের ছুটি পাওয়া গেল, তাই দশটার ট্রেনে এসে নেমেছি। এসো এসো, ভেতরে এসো—

আকাশ থেকে যেন হঠাৎ মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লাম।

দাঁতে দাঁত চেপে শুকনো গলায় বললাম, নাঃ থাক। আজ আর ভেতরে যাবো না, কাল-পরশু এসে দেখা করব।

ফলের ঠোঙা আর ওষুধের বোতলটা কঠিন নির্দয় মুঠিতে আঁকড়ে ধরে দ্রুত গতিতে সরে পড়তে চাইলাম সেখান থেকে। খিদে, তেষ্টা আর ক্লান্তিতে সমস্ত শরীরটা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আজই—আজই কেন ফিরে এল ভবানী ? কেন অন্তত একটা দিন সে আমাকে সময় দিল না, কেন এমন করে ছুটির এই আশ্চর্য সকালটাকে সে এভাবে হত্যা করল ?

সে আশ্চর্য সকালটা আর নেই। ছুরির শানানো ফলার মতো ঝলসাচ্ছে রোদ। তবু এখনো 'শ্রী'-তে গেলে হয়তো "র‍্যানডম্ হারভেস্ট"-এর টিকেট পাওয়া যাবে, অথবা পূর্ণকে জোগাড় করে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার প্রোগ্রামটাও হয়তো অসম্ভব নয়।

কিন্তু—

বিক্রম থামল।

বাইরে বৃষ্টি আরো বেড়েছে। একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, কিন্তু এখানেও শেষ নয়। আরো আছে তারপর। আর একটা নতুন অধ্যায়।

—বলে যাও।

—'তাহলে আর' একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে মিসেস গুপ্ত।

আমি বললাম, কেন, থেকে যাও এখানে আজ। রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই হবে না হয়। বিক্রম হাতঘড়িটা দেখে বললে, না ভাই, সে উপায় নেই। একটা অ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট রয়েছে, এক কাপ চা হলেই চলবে শুধু!

—দেখছি—ভেতরে চলে গেল কল্যাণী।

বাইরে বৃষ্টির ছাট্‌ লেগে ঝাপসা হয়ে আসা ইলেক্‌ট্রিকের অলোগুলোর দিকে তাকিয়ে বিক্রম বললে, আর আমি যাইনি ভবানীর বাড়ি। আমাকে নিছক রোমান্টিক ভেবো না সুকুমার। আমি জানি এর পরে কী ঘটত। যে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ওদের কাছে আমি পৌঁছুতে পারতাম সে পথ আমার বন্ধ হয়ে গেছে—বড় চাকরী পেয়েছে ভবানী। তারপর আমি কোথায়?

চা-টা শেষ করে স্বপ্নালু ভঙ্গিতে আবার শুরু করল বিক্রম ঃ কিন্তু এর পরে সত্যি সত্যিই আমার জীবনে এল একজন।

অর্চনা মিত্র।

এল চাঞ্চল্যের মতো। শুধু আমার নয়, সাবা অফিসে প্রক্ষেপের মতো একটি মহিলা-কেরানী। অফিসের মধুচক্রে তার আবির্ভাব হল একেশ্বরী রূপে।

অত্যন্ত গম্ভীর মুখ! দেখতে শুনতে মোটামুটি চেহারা—বেশ ছিমছাম মসৃণতায় উজ্জ্বল। গাম্ভীর্যটা যে নিতান্তই

ধার করা, একান্তই আত্মরক্ষার বর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, তারও পরিচয় পাওয়া গেল কিছু দিনের মধ্যে।

যোগাযোগটা ঘটল অদ্ভুত।

শনিবারের দিনে সিনেমার টিকিট যখন করেছিলাম, তখন কি জানতাম ঠিক আমার পাশের সীট্‌টিতেই বসবে অর্চনা মিত্র? আমার একান্ত সান্নিধ্যেই এগিয়ে আসবে অফিসশুদ্ধ সমস্ত কেরানীদের স্বপ্নচারিণী?

অফিসে বহুর মধ্যে আমিও অন্যতম কিন্তু সিনেমা হাউসে আমিই একতম। মুখ চেনাটা এই তুঘণ্টার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল পরিচয়ে। আর সেই পরিচয়ের পেছনে অনেকখানিই প্রভাব ছিল সম্মুখের রূপালি পর্দার—সে পর্দায় তখন 'মালা আর দ্য সেভেন সীজ' রক্তের মধ্যে উত্তাপ সঞ্চার করছে নেশার মতো।

তার পরের ঘটনা বিস্তৃত করব না।

অনেক জল গড়িয়ে গেল এর মধ্যে। অফিসে পদোন্নতি হল আমার। বাংলার বাইরেও কোম্পানীর কিছু কিছু অফিস ছিল, যাতায়াত শুরু করলাম নানা জায়গায়।

এই সময়ে জীবনে আমি প্রথম পাপ করলাম স্কুমার। হত্যার চেয়েও নিষ্ঠুর ভাবে শোধ নিলাম পৃথিবীর ওপর, জীবনের ওপর।

—পাপ?

—হ্যাঁ, পাপ। আজ আমি অন্যরকম হয়ে গেছি—হৃদয়ের বালাই আমার নেই বল্‌লেও চলে। দেখেই তা বুঝতে পারছ।

কিন্তু সেদিনের একটা ক্ষ্যাপামির ধাক্কায় যা করে ফেলেছিলাম, আজও তার প্রায়শ্চিত্তের পথ খুঁজে পাই.না।

ক্ষমা কোরো কুসুমার। আনাড়ী ব্যাট্স্ম্যান! খেলায় আউট হয়ে গিয়ে যদি নিরীহ কাউকে অকারণ আক্রমণ করে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার অমার্জনীয় মনে করো না তুমি। জেনো, মানুষ মানুষই—সে দেবতা নয়।

টুরে বেরিয়েছি তখন। এসেছি আলিগড়ে। একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়েছি। এমন সময় বুকে এসে আর একবার বিঁধল মণিকা সেনের হাসির তীর—আর একবার বোল্ড আউট হয়ে গেলাম আমি।

আর কিছুই নয়, একখানা চিঠি। প্রচণ্ড আঘাত আর একটি।

বাইরের দিকে চোখ মেলে দিয়ে বিক্রম বললে, শোনো ঃ

* * * *

অনেক ঘুরে ঘুরে চিঠিটা এসে পৌঁছুল আলিগড় শহরের বিশ্রী পুরানো হোটেলটায়। একবার ঠিকানা কাটা হয়েছে ফতেপুরে আর একবার দিল্লীতে। কেমন নরম আর তেলতেলে হয়ে গেছে পোস্টকার্ডটা, দুমড়ে দুমড়ে গেছে কোণাগুলো, ভাজ পড়েছে মাঝখানটায়। আর একবার ঠিকানা কাটলেই চিঠি আর এসে পৌঁছোত না, পথেই গয়াপ্রাপ্তি হয়ে যেত বোধ হয়।

তবু চিঠিটা পৌঁছেছে। এবং না পৌঁছলেই হত ভালো।

আর মাত্র চৌদ্দ ঘণ্টা দেরি হলেই হয়তো চিঠিটার আঘাত থেকে মুক্তি পেতাম আমি। তারপর অনেক—অনেকদিন পরে, সময়ের প্রভাবে ফিকে, বর্ণহীন হয়ে যখন আমার কাছে আসত সংবাদটা, তখন হয়তো—

কিন্তু আমার প্রয়োজনের পরিমাণে পৃথিবীকে পাওয়া যায় না। তার রীতি আছে নিজস্ব। তার ধর্ম আছে স্বতন্ত্র। তাই বড় অসময়ে, বড় নিষ্ঠুর ভাবে আঘাতটা এসে বেজেছে। ব্রাঞ্চগুলোতেও নানা বিপর্যয়—কোনোটাই সামলাতে পারছি না আমি। এভাবে আরো কিছুদিন চললে চাকরি থাকবে না। দিন কয়েক আগে কানপুর স্টেশনে জানলা গলিয়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে ডান হাতে সাংঘাতিক চোট লেগেছে একটা—এখনো যন্ত্রণায় টনটন করে ওঠে সেখানে। শরীর মন কোনোটাই প্রস্তুত ছিল না।

পুরোনো ব্যাপার, পুরোনো খবর। অর্চনা মিত্র, অর্চনা দত্ত হয়েছে গত দশই ফাল্গুন তারিখে। কী তিথি ছিল সেদিন? চতুর্দশী অথবা পূর্ণিমা? ছুটির দিনে একবার ওদের বাড়ি থেকে আমি বেড়িয়ে এসেছিলাম। উলুবেড়ে শহরে নিশ্চয় জ্যোৎস্নার জোয়ার নেমেছিল সেদিন, নিশ্চয় বাতাসে আসছিল আমের বন থেকে মৌ-ঝরানির গন্ধ, কোকিলের ডাকের নিশ্চয় বিরাম ছিল না, আর লক্‌গেটের পাশে নিশ্চয় গঙ্গার জল ফুলে উঠেছিল জোয়ারের আবেগে। সানাই নিশ্চয়ই বাজছিল, বাঙালির বিয়েতে তো রেওয়াজ আছেই। আর চেলির অন্তরালে অর্চনার

মুখে লজ্জার একটা পেলব আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন তাকে দেখে কে বলতে পারত, অফিসের মধুচক্রের মাঝখানে কঠোর মুখ একটি মেয়ে, যার কোনো রস-কষের বালাই আছে বলে মনে করবার হেতু নেই? অথবা বিলাতী সিনেমা হাউসে যার পাশে বসে 'মালা অব্ দ্য সেভেন্ সীজ' কে উপলব্ধি করা যেত, এ সেই মেয়ে!

আর সেই রাত্রি—সেই তিথি! মনে আছে বই-কি। কানপুর স্টেশন। জানলা দিয়ে দিল্লী এক্স্প্রেসে ওঠা। বাইরে থেকে কে একটা দেড়মণী সুটকেস ছুঁড়ে দিলে, কাঁধ বরাবর এসে পড়ল সেটা, মনে হল হাতখানা যেন ছিঁড়ে শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে আমার। ইণ্টারক্লাস কামরাটার ভেতরে দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই—ভিড় আর অসহ্য গরম। বাঙ্কের ওপর থেকে ঘুমন্ত মারোয়াড়ীর একখানা জুতোশুদ্ধ ঝুলন্ত পা গাড়ির ঝাঁকুনির তালে পেণ্ডুলামের মতো নিয়মিত ছন্দে ঠকাস্ ঠকাস্ করে এসে লাগছে আমার কপালে। বাইরে কি জ্যোৎস্না ছিল? কে জানে। কিন্তু মাথার ওপকার ইলেকট্রিক আলো থেকে অজস্র পোকা এসে ছড়িয়ে পড়ছিল চোখেমুখে। কোকিল ডাকছিল কি? জানা নেই, কারণ তখন কামরার ভেতর উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজনীতি, সঙ্গীত আর নাসিকা-গর্জনের একটা মিশ্র-রাগিণী। আমের মুকুলের গন্ধ আসছিল না—রাশীকৃত মালের চাপে হাট-করে-খোলা ল্যাভেটরীর দরজা থেকে বিষাক্ত বীভৎস গন্ধের উচ্ছ্বাস এসে সমস্ত শরীরকে যেন বিষিয়ে দিচ্ছিল।

সেই রাত্রে—ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো সন্ধ্যা আটটা থেকে ভোর ছটায় দিল্লী পৌঁছানো পর্যন্ত দুর্বিষহ যন্ত্রণার অবকাশে, আটশো মাইল দূরে অর্চনা মিত্রের বিয়ে হয়ে গেছে।

পুরোনো ব্যাপার—পুরোনো আঘাত। প্রতিশ্রুতি রাখেনি অর্চনা, সাধারণ বাঙালী ঘরের কজন সাধারণ মেয়ের পক্ষেই বা সেটা রাখা সম্ভব? কিন্তু বড় অসময়ে এসেছে খবরটা—বড় অপ্রস্তুত মুহূর্তে। দারুণ দুঃসময়ে অন্তত আমার মনের কাছে প্রলেপের মতো হয়ে থাকা উচিত ছিল কৃষ্ণকলির মায়া, খঞ্জনা নদীর ধারে অঞ্জনার রূপকথা। কিন্তু সমস্ত রূপকথা আমার আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে গেল!

ঠাট্টা কোরো না সুকুমার, জীবনে এই প্রথমবার যেন নিষ্ঠুর পরাজয়ের যন্ত্রণা বোধ করেছিলাম। এসেছিল আত্মহত্যা করার দুর্বলতা—সেই প্রথম, আর সেই শেষ। চিঠি পাবার পর মনে হচ্ছিল শুধু আত্মহত্যাই করা চলে এখন। অত্যন্ত সহজেই করা চলে। এই তেতলার জানলা দিয়ে নিচের বাঁধানো উঠোনটার ওপর একটা ঝাঁপ দিলেই হয়—চক্ষের নিমেষে মাথাটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে একটা মাটির পাত্রের মতো। অথবা ড্রেসিং টেবিলটার ওপরে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দেই কড়িকাঠের হুকের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে নেওয়া চলে হোল্ড-অলের শক্ত স্ট্র্যাপটার—এখনো নতুন আছে—বেশ সইবে আমার এত বড় শরীরটার ভর। তা ছাড়া সুটকেসে ক্ষুরটা তো আছেই—একেবারে আয়নার মতো ঝকঝক করছে, আজই সেটাকে শান দিয়ে এনেছি

আমি ; গলার নলীতে বসিয়ে একখানা ইট তুলে জোরে ঘা লাগালেই চলবে—বেশি পরিশ্রম করবার দরকারই হবে না কোনো।

যেমন করা উচিত, ঠিক তেমনি ভাবেই ঘরের মধ্যে অসংলগ্ন পায়ে ঘুরে বেড়ালাম আমি, ঘুরে বেড়ালাম সেই বিকেল পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত। তারপর যখন পা দুটোকে অত্যন্ত বেশি ভারী বলে মনে হল, অনেকক্ষণ ধরে দাঁতে দাঁত চেপে রাখবার ফলে মাড়িদুটো টনটন করে উঠল যখন, তখন জানালার ধারে এসে বসলাম বাইরের দিকে জ্বলন্ত চোখের ক্ষুব্ধ আর ক্ষিপ্ত দৃষ্টি মেলে দিয়ে।

পেটা ঘড়িতে সশব্দে বারোটা বাজল কোথাও ; নিস্তব্ধ হয়ে-আসা রাত্রির বুকে তরঙ্গ জাগিয়ে দূরের লাইন বেয়ে বেরিয়ে গেল টুণ্ডলাযাত্রী প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা। হঠাৎ যেন ঘোর ভাঙল আমার। সরে এলাম জানালার ধার থেকে, মেঝে থেকে স্যুটকেস্‌টা তুললাম খাটের ওপর, ডালা খুলে ফেলে সেটার ভেতরটা হাট্‌কাতে লাগলাম আমি।

কী ভাবছ সুকুমার? না, না, ক্ষুর বার করিনি। বার করলাম অর্চনার ফোটোখানা। বুকের ওপর দিয়ে দুটি কালো সাপের মতো দুটি বেণী দুলিয়ে দিয়েছে অর্চনা, কপালে পরেছে টিপ, হাসিতে মুখ আলো হয়ে আছে। কত কাছে চলে এসেছে, আমার উত্তপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শে অল্প অল্প কাঁপছে ছবিটা। মনে হচ্ছে ইচ্ছে করলেই এই মুহূর্তে তাকে বুকে টেনে নেওয়া চলে,

একটা প্রবল আর পৈশাচিক চাপে পাঁজরাগুলো মট্‌মট্‌ করে ভেঙে দেওয়া যায় তার। কিন্তু কিছুই করা যায় না। দশই ফাল্গুন রাত্রিতে এখান থেকে আটশো মাইল দূরে, অর্চনা মিত্রের বিয়ে হয়ে গেছে।

ছবিটাকে উল্‌টে ধরলাম আমি। পেছনের শাদা দিকটার মেয়েলি নিটোল হাতের লেখা, "আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।" বেশ বেছে বেছে লাইনটা লিখেছিল অর্চনা। অথবা অর্চনা শুধু একাই নয়—ওটা হয়তো প্রত্যেক মেয়েরই কবচ-কুণ্ডলের মতো সহজাত। মনে আছে, যে-সন্ধ্যায় ছবিটা আমাকে দিয়ে ছিল সে—যেদিন মনে হয়েছিল সত্যি সত্যিই বুঝি বাংলা দেশের বংশীবটের নিচে আমি তার পাতার ভেঁপু কুড়িয়ে পেলাম।

এখন শ্রীযুক্ত দত্তকে এই ফটোটা পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

কল্পিত প্রতিহিংসার একটা হিংস্র আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল আমার মন। আবার উঠে পড়লাম, অর্চনার ফটোটাকে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে ঘরময় ঘুরে বেড়ালাম অনেকক্ষণ। আলোটাকে তখন আর সইতে পারছিলাম না। চোখের ভেতর দিয়ে ঢুকে সেটা কেমন লঙ্কার ঝাঁজের মতো একটা জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। তাই খট্‌ করে একসময় ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিলাম। অন্ধকারে নিজেকেই যখন আর দেখতে পেলাম না, তখন ঘরের অবরুদ্ধ তামস স্তব্ধতায় ভেতরে একটা নিশাচর জন্তুর মতো শিথিল সতর্ক পায়ে সারারাত চলে ফিরলাম আমি।

কিন্তু বেদনা বিলাসের সময় কই। কাজ—অফুরন্ত কাজ।

বিরহী ব্যর্থ মানুষের মতো দুদণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যে থাকব তারও অবকাশ নেই আর। ভোরের আলো ফুটে ওঠবার আগেই জিনিষপত্র প্যাক করে নিতে হল, দাঁড়ি কামাতে হল, স্নান করেও নিতে হল। রাত্রি জাগরণের একটা আড়ষ্ট ক্লান্তি, মস্তিষ্কের মধ্যে সব কিছু ফাঁপা হয়ে যাওয়ার মতো একটা অনুভূতি—সব কিছু ভুলে যেতে হল আমাকে। কাজ—কাজ। আজ দুপুরের আগেই আগ্রা পৌঁছুতে হবে আমাকে। পুরো দুটো দিন কেটে যাবে ওখানকার অফিসের কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে। তারপর আবার দিল্লী। এনগেজমেন্ট প্যাডের প্রত্যেকটি পাতা লাল কালির আঁচড়ে চিহ্নিত—একটা দিনও এমন হাতে নেই আমার যা এই নিভৃত বেদনাকে নিশ্চিন্তে রোমন্থন করবার মতো সময় দিতে পারে আমাকে।

সুতরাং ঘড়িতে যেই কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা বাজল, তখনি একটা টাঙ্গা ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাসের উদ্দেশ্যে।

আলিগড় টু আগ্রা, আলিগড় টু মথুরা। ইউ. পি. গবর্নমেন্ট বাস সারি সারি অপেক্ষা করছে। টিকেট কিনে বাসে উঠে বসলাম। পরিষ্কার ঝকঝকে গাড়ি। চমৎকার গদী আঁটা সীট্‌গুলো—ঠিক যে-কটি সীট্ তার একজন বেশি নেবার উপায় নেই। বাংলা দেশের খোয়া-ওঠা অথবা হাঁটু পর্যন্ত ধুলোসঞ্চিত

ভাঙাচুরো পথ দিয়ে যেসব শ্রীহীন বিবর্ণ বাস সর্বাঙ্গে বাছড়ের মতো যাত্রী ঝুলিয়ে যাতায়াত করে, তাদের সঙ্গে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

কিন্তু সেইরকম একখানা বাস হলেই হত। সেই রকম ভাঙাচুরো একখানা গাড়িই বয়ে আনত বাংলা দেশের পরিচয়, বাংলাদেশের সান্নিধ্য। যে বাংলা দেশকে আমি ভালো বেসেছি, যেখানকার শ্যামলা মেয়েরা বারে বারে পথ ভুলিয়ে আমাকে নিয়ে যেত যেন মরীচিকার মধ্যে। তাহলে গাড়ির ঝাঁকুনি খেতে খেতে আরও বেশি করে মনে পড়ত অর্চনার কথা। অতি পরিচিত মাঠ ঘাট জলা জঙ্গল আর বড় বেশি সবুজ পল্লীশ্রীর দিকে তাকিয়ে ব্যথায় বিকল হয়ে যেত মন, সহযাত্রিণী কোনো চেলি-পরা নববধূর অবগুণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে হু হু করে উঠত বুকের ভেতরে। কিন্তু এই অতি পরিচ্ছন্ন বাস, আশেপাশের এই অপরিচিত মানুষের দল—বাইরে মেঘবর্ণ অড়হর ক্ষেতের দিগন্তবিস্তার—এর ভেতরে মন যেন কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে না, খুঁজে পাচ্ছে না কোনো ভীরু আর পলাতক জন্তুর মতো নিভৃত কন্দরে লুকিয়ে নিজের ক্ষতলেহনের সুযোগ।

নিরুপায় ভাবে একখানা হিন্দী দৈনিকপত্র কিনে নিয়ে তার পাতায় মনোযোগ দিলাম আমি।

পঞ্চাশ মাইলের ওপরে রাস্তা—তিন ঘণ্টার বেশি সময় নেবে। সেকেলে ভাঙা বাড়ি, কেল্লার ধরনে তৈরি করা জমিদারের সাবেকী প্রাসাদ, পশ্চিমের স্বভাবসিদ্ধ ঘননিবিষ্ট গ্রাম আর

আদিগন্ত অড়হরের ক্ষেত পাশে পাশে রেখে কংক্রীটকরা পথের ওপর দিয়ে বাস উড়ে চলেছে আলিগড় টু আগ্রা। আয় তিন ঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে পৌঁছুবে। এবং তিন ঘণ্টা পরে কাগজ পত্রের স্তূপের মধ্যে একেবারে তলিয়ে থাকব আমি—অর্চনার ফোটোটা যে বুকপকেটেই আছে, সে কথা তখন মনেও থাকবে না আর।

কিন্তু মিনিট দশেকও কাটল না। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উৎলাম।

অন্যমনস্ক ছিলাম বলেই লক্ষ্য করিনি এতক্ষণ। এই বাসে যে দুজন বাঙালী যাত্রী আছে এবং তারা বসেছে ঠিক আমার সামনের সীটেই। কানে যেন তীরের মতো কথাটা এসে বিঁধল।

—আজকের দিনটা একটা আশ্চর্য দিন মিনু। জীবনে একে ভুলতে পারব না।

পাশের মেয়েটির স্নিগ্ধ কোমল গলায় চাপা শাসন শুনতে পাওয়া গেল: আস্তে। আশে পাশে আরো কতগুলো লোক যে রয়েছে সে খেয়াল নেই বুঝি?

—কিছু ভয় নেই মিনু। সব নির্ভেজাল পশ্চিমা, কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।

সব নির্ভেজাল পশ্চিমা! চমকাতে গিয়েও আমি চমকালাম না। মনে পড়ল আমি বাঙালী নই, একথাটা আমার মনে না থাকলেও পৃথিবীতে আর কারো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া আমার পরনে পাজামা, পাঞ্জাবির ওপরে চাপানো

তশরের জহর কোট। মাথায় শেঠজী-মার্কা কালো গুজরাটি টুপি, হাতে হিন্দী খবরের কাগজ। না—আমাকে সন্দেহ করবার প্রশ্নই ওঠে না।

একটি ছেলে, একটি কুমারী মেয়ে। কথার স্বরে আর সুরে সম্পর্কটা অনুমান করে নিতে সময় লাগে না। নিজের যন্ত্রণার জন্যেই যেন বিশ্রী লাগল ওদের। অসীম বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করে আবার কাগজে নিবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু গাড়িতে কেউই ওদের রসালাপ বুঝতে পারবে না এটা অনুমান করে স্বচ্ছন্দেই প্রগল্‌ভ্ হয়ে উঠেছে দুজনে। মানুষে প্রেমে পড়লে আশেপাশের পৃথিবীতে আরো যারা আছে তাদের সম্পর্কে কি ভোঁতা হয়ে যায় নাকি অনুভূতি? চোখ বন্ধ করে ভাবে জগতে কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছে না?

—আমার ভয় করছে সুধীরদা। বাবা হয়তো রাজী হবেন না।

—রাজী না হলে তো উপায় নেই শান্তা। আজ তোমাকে না হলে আমার যে একটা দিনও চলবে না সে তো তুমিই সব চেয়ে ভালো করে জানো। বেঁচে থাকার কোনো মূল্যই থাকবে না আমার কাছে।

খবরের কাগজের আড়ালে একটা বিকৃত হাসি দেখা দিল আমার মুখে। আর কতকাল চলবে এই মিথ্যে করার জের টেনে চলা, ওই পুরোনো প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি? কোনো মূল্য থাকবে না জীবনের? কী করবে সুধীরদা? আত্মহত্যা?

আত্মহত্যা। কাল রাত্রে একথা আমিও ভেবেছিলাম! জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারতাম। নিচের বাঁধানো উঠোনটায়, হোল্‌ড্‌-অলের স্ট্র্যাপ্‌টা কড়িকাঠের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়তে পারতাম, গলায় বসিয়ে দিতে পারতাম চকচকে শান দেওয়া ঝকঝকে ক্ষুরখানাকে। কিন্তু পারিনি।

—সত্যি, তোমার সঙ্গে ক'দিনের বা আলাপ? অথচ মনে হয়—মেয়েটির গলায় সেই অর্চনা মিত্র সাড়া দিয়ে উঠল : মনে হয় সারাজীবন তুমি আমার পাশাপাশি রয়েছ।

—অথচ মাত্র দেড়মাস। কুতুব থেকে দিল্লীতে ফেরবার পথে তোমাদের টাঙ্গার ঘোড়াটা পা ভেঙে বসে পড়ল—মনে আছে? সবুজ সিল্‌কের শাড়ী পরে একটা গাছের নিচে বিব্রত মুখে তুমি দাঁড়িয়েছিলে—

তীব্রভাবে একটা ধমক দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল আমার—চুপ করো। আশ্চর্য, ওই এক কথা—একই ধরনের কথা আওড়াতে কখনো কি ক্লান্তি আসবে না মানুষের, আসবে না বিতৃষ্ণা? একটা নতুন কিছু বলুক, ওই ধোঁয়াটে ঝাপসা কথার জাল না বুনে সহজ হওয়ার চেষ্টা করুক—স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। সবুজ সিল্‌কের শাড়ী পরে বিব্রত মুখে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল শান্তা; কিন্তু টাঙ্গার যে ঘোড়াটা পা ভেঙে পড়েছিল পথের ওপর (কল্পনার দৃষ্টিতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি), যার রোঁয়া-ওঠা বিবর্ণ পিঠটার ওপরে টাঙ্গাওয়ালার চাবুকের দাগ রক্তাক্ত হয়ে ফুটে ছিল—রক্তচিহ্নে ভন্‌ভন্‌ করছিল

ডাঁশ, আর যার মুখের কষে কষে তুষারকণার মতো সাদা ফেনার রেখা দেখা দিয়েছিল সেই ঘোড়াটাকে কেন এত সহজেই ভুলে যাচ্ছে সুধীরদা? ক্ষমা কোরো সুকুমার। সে সময়ে আমি সিনিক্ হয়ে উঠেছিলুম। তোমাকে তো বলেছি, অমন দুর্বল মুহূর্ত আমার জীবনে আর কখনো আসেনি।

—আমরা মোটর থামালুম। আমি বললুম, যদি কিছু মনে না করেন, আমার গাড়িতে তো জায়গা রয়েছে, আপনাদের নিউ দিল্লীতে পৌঁছে দিতে পারি। সেই মুহূর্তে দুটি চোখে যেন আলো জ্বেলে তুমি আমার দিকে তাকালে—

নাঃ, অসম্ভব। খবরের কাগজের পাতায় পুরো দু কলম-জোড়া হিমালয়-ফেরত যোগীর ওষুধের বর্ণনাতেও মনকে নিবিষ্ট করা যাচ্ছে না! জানলার বাইরে মাথা গলিয়ে দিলাম।

কংক্রীটের পথের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাস্—আলিগড় টু আগ্রা। রোদে পোড়া তামাটে মাটি—গাছের পাতাগুলোতেও যেন পশ্চিমের উত্তাপলাগা ধূসরতা। আচক্রবাল অড়হরের ক্ষেতে যেন রাশি রাশি আকাশের মেঘ নেমে এসে থমথম করে রেখেছে। বাংলার সবুজ সরসতা কোথাও নেই—চোখ জুড়িয়ে যায় না, হারিয়ে যেতে চায় না কোথাও। একটা শুষ্ক ঔদাসীন্যে চেতনাকে কঠোর করে আনে, অশ্রু-করুণতায় নিজেকে আবিল করে আনে না।

তাই, নিরাসক্তভাবে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। অড়হর ক্ষেতের মাঝে মাঝে উঁচু বেদীর মতো জায়গায় জায়গায়

উঠেছে কাঁচা ইঁদারা, রহট্টা তার মাথায়। মাঠের বুকের ভেতর দিয়ে শূন্যতার শৃঙ্খল গাঁথতে গাঁথতে এগিয়ে চলেছে গ্যাঞ্জেস্ ক্যানালের হাইড্রো-ইলেক্ট্রিকের তার। বাংলা দেশের মতো নীল বনচ্ছায়ার কোনো রেখা দিগন্তকে সীমান্বিত করেনি এখানে—মেঘবর্ণের ক্ষেত ক্রমশ আকাশের সঙ্গে রং মেশাতে মেশাতে শেষে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। কত তফাৎ বাংলার প্রান্তরের সঙ্গে। তার তালবনের ইসারা-দেওয়া সীমান্তের দিকে তাকালেই যেন মনে হয় ওখানে ঘর আছে, আশ্রয় আছে ; ওখানে খড়ের চালে শালিক-নাচা কোনো বাড়ির দাওয়ায়, লেবু-ফুলের গন্ধেভরা কোনো ছায়াগভীর অবসরে একটি মেয়ে প্রতীক্ষা করে বসে আছে। কিন্তু এখানকার দিগন্ত সে আশ্বাস দেয় না—সে স্বপ্নও আনে না, শুধু একটা শূন্য অর্থহীন আর শ্রান্ত যাত্রার দিকে কঙ্কালের মতো আঙুল বাড়িয়ে দেয়। আর নিঃসঙ্গতাকে গেঁথে চলা ওই হাইড্রো-ইলেক্ট্রিকের তার বারে বারে মনে পড়িয়ে দেয় ওর একটা প্রান্ত গিয়ে পৌঁছেছে আগ্রা শহরে—যেখানে কাজ, অফুরন্ত কাজ। যেখানে কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে একবার তলিয়ে গেলে নিশ্বাস ফেলবারও আর সময় থাকবেনা আমার।

কিন্তু তালবন—বাংলা দেশ। সত্যিই কি সেখানে ঘর আছে ? কই, সে ঘরের সন্ধান তো আমি পেলাম না, আমার তো জায়গা জুটল না সেখানে। আমি বাঙালী নই বলেই কি আমার কাছে বন্ধ হয়ে রইল বাংলার দরজা ? মণিকা হল নিষ্ঠুর

ব্যঙ্গ, পূর্ণিমা হল এক মুহূর্তের মোহভঙ্গ, আর অর্চনা হল নিষ্ঠুরতম আঘাত?

একটা ছোট শহরের বাড়ি-ঘর ক্রমশ ঘন হতে হতে নিঃসীম শূন্যতাকে আড়াল করে দিলে, বাসের গতি মন্থর হয়ে এল, থেমে দাঁড়ালো বাস্। হাথ্‌রাস্। ভাবনাও আমার বিশ্রাম পেল একটু।

দুজন যাত্রী নামল, দুজন উঠল। গাড়ির ড্রাইভার আর কণ্ডাক্‌টার নেমে গেল বিড়ি টানতে। একটা বার বছরের ছেলে বই বিক্রী করতে এসে সিনেমার সুরে গান ধরলে। দু আনা করে বইয়ের দাম—যারা কিনছে তারাও সুর ধরে পড়তে শুরু করেছে সঙ্গে সঙ্গে। দহিবড়া, গোলগপ্পা আর ঘুগ্‌নিওলারা এসে বাস্‌কে ছেঁকে ধরেছে।

সব মিলিয়ে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই সম্ভব নয় আর। আবার সেই দুঃসহ কল-কাকলী শুরু হয়ে গেছে।

—কী জায়গা এটা?

—হাথ্‌রাস্। এখান থেকে ট্রেনে করে মথুরা-বৃন্দাবন যায় লোকে। যাবে নাকি বৃন্দাবনে?

—একবার দেখতে ইচ্ছা করে—শান্তা জবাব দিলে।

—তীর্থ করার দিন এখনো আমাদের আসেনি শান্তা, তার এখনো অনেক দেরি। এখন আমাদের সামনে রয়েছে নীল যমুনার ধারে তাজমহলের মর্মরস্বপ্ন। পৃথিবীর সব চাইতে মহৎ প্রেম সেখানে কালকে জয় করে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করে আছে তোমার আমার মতো আরো—

উঃ, কী সাজিয়ে কথা বলছে, গলার সুরে এনে ফেলেছে একটা নাটকীয় রসাবিষ্টতা। সব নির্বোধের জীবনেই একদিন আসে এমনি করে কথা বলবার প্রেরণা, লক্‌গেটের ওপর দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার দোলা লাগা জলের দিকে তাকিয়ে এমনি-ভাবেই কী যেন বলছিলাম অর্চনাকে। বলেছিলাম, এই রাত, এই জ্যোৎস্না, এই ঝলমলে জল। কতকাল ধরে এরা কত মানুষের ভালোবাসার নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।

আচ্ছন্ন সুরে শান্তা বলছে, তাজমহল, কবির স্বপ্ন—

তাজমহল—কবির স্বপ্ন! হিংস্রভাবে নিচের ঠোঁটে বোধ হয় দাঁতের চাপ দিয়েছিলাম সুকুমার, ঠোঁট কেটে গেল খানিকটা। মৃদু জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে নোনতা স্বাদ অনুভব করতে করতে ভাবতে লাগলাম: কত কোটি টাকা খরচ হয়েছিল ওই কবির স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে? ওর একটা অতি সামান্য ভগ্নাংশ পেলেও হয়তো মণিকার মতো অনেক মেয়ে সেধে মালা দিত আমাকে, আর হয়তো, হয়তো অর্চনা মিত্র আজকে দত্ত না হয়ে!—কবির স্বপ্ন! একটা ব্যক্তিগত শোককে ঘোষণা করবার জন্যে সম্রাটের রাজকীয় আড়ম্বর। ওর একটা অতি সামান্য ভগ্নাংশ যেখানে মানুষকে বাঁচাতে পারত, দিতে পারত তাকে জীবনের নিঃসংশয় সহজ অধিকার—সেখানে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে ওই মৃত্যুবিলাস শুধু পঙ্গু কল্পনা আর সস্তা ভাবালুতাকেই সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে।

সারা মনটা জ্বলতে লাগল। তাজমহল! কতই তো

ভূমিকম্প হয়, ওটাকে কেউ কি গুঁড়িয়ে দিতে পারে না চিরকালের মতো ?

ভোঁপ—ভোঁপ। ভেঁপু বাজল। গাড়ি নড়ে উঠেছে। আবার শহরের রেখা ছাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই ছায়াহীন আশাহীন মেঘবর্ণ দিগন্তের বুকে। দশটা বেজে গেছে ঘড়িতে—পশ্চিমের পাথুরে মাটিতে প্রখর হয়ে উঠেছে সূর্য, পরিকার্ণ হয়ে পড়েছে রিক্ত ঔদাসীন্যের মতো ধূসরতা। মনকে অশ্রুতে আবিষ্ট করে আনে না, একটা তিক্ত অনাসক্তিতে উদাস করে তোলে। আর হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকের তার হাতছানি দিয়ে ক্রমাগত বলতে থাকে, সময় নেই, সময় নেই। কাজ—অফুরন্ত কাজ।

বিক্রম থামল। হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো একবার। তারপর ঃ অবিশ্রান্ত কাজ—অফুরান কাজ। এই কাজের তাগিদ আছে বলেই বোধ হয় কাল রাত্রে অনেক সুবিধেজনক পরিকল্পনা সত্ত্বেও আত্মহত্যা করতে পারিনি। বনচ্ছায়ার স্বপ্ন মিলিয়ে যেতেই এসেছে নিরানন্দ বিবর্ণ দিগন্তের হাতছানি। একদিন ওই সীমাহীন ধূসরতায় অর্চনাও হয়তো মিলিয়ে যেত একটা ছায়াবাজীর মতো, একটা অশরীরী-সত্তার মতো, যেমন অড়হরের ঘনসমুদ্র ফিকে হতে হতে হারিয়ে গেছে আকাশের পাণ্ডুরতায়—সেও তেম্‌নি একাকার হয়ে, বিদেহী হয়ে হারিয়ে যেত। শুধু সত্য হয়ে থাকত ওই ইলেক্‌ট্রিকের কালো তারের রেখা—যা মাঠ-ঘাট-বন-বনান্তরকে একটা অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলে বেঁধে চলেছে।

কিন্তু হারিয়ে ফেলতে চাইলেও হারাতে দিচ্ছে কই এরা? ভুলতে দিচ্ছে কই সামনের সীট্ থেকে ওই অবিচ্ছিন্ন কলগুঞ্জন? ইতিমধ্যেই তো আমার মনের সামনে জেগে উঠেছিল মোটা মোটা হিসাবের খাতা, তার কালো কালো হরফ, ডেবিট-ক্রেডিট, লাভ-লোকসান, আয়-ব্যয়ের অরণ্যময়তা। কিন্তু ওরাই বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে তার পাঞ্জাবির বুক পকেটে রয়েছে অর্চনা মিত্রের ছবি, কুমারী অর্চনা মিত্র। বুকের ওপর ললিত ছন্দে দুটি বেণী দিয়েছে দুলিয়ে, পাত্‌লা ঠোঁটে কুহক মন্ত্রের মতো ফুটে আছে অপরূপ একটা হাসির রেখা। কিন্তু দশই ফাল্গুন রাত্রিতে, এখান থেকে আটশো মাইল দূরে—

—নাঃ—

একটা অসহ্য বিরক্তিতে সিগারেটটা ছুঁড়ে দিলাম বাইরে।

—জ্যোৎস্নায় তাজ দেখেছ কখনো?

—না

—দ্যাখোনি শান্তা? সে একটা আশ্চর্য রূপ। দিনের চেনা তাজমহল জ্যোৎস্নার আলোয় একেবারে বদলে যায়। মনে হয় যেন পৃথিবীর যত ব্যথা, যত কামনা ওই পাষাণ স্তূপে রজনীগন্ধার মতো ফুটে উঠেছে। মর্মরের ওপর সেই রাত্রির মায়ায় মনে হয় যেন কার অশ্রুভরা চোখ চাঁদের আলোয় টলটল করে উঠেছে—

আবার খবরের কাগজটা তুলে নিলাম হাতে। লক্ষ্ণৌ শহরে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়েছে একটা—ছোরা দেখিয়ে ডাকাতি

করেছে দিন-দুপুরে। বুলন্দশহরের একটা গ্রামে আগুন লেগে ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে অনেকগুলো। অমুক মন্ত্রী গতকাল এলা-হাবাদের এক বিরাট জনসভায় বিশাল এক বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন, আর ভাবনা নেই, এবার আর দেশে খাদ্যাভাব ঘটবে না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। কথাগুলো ভেসে আসছে নিয়মিত ভাবে, ভেসে আসছে অসহ্য বিরক্তির মতো, দুর্বিষহ একটা যন্ত্রণার মতো।

—একদিন সন্ধ্যার কথা আমি ভুলব না শান্তা। মার্বেলের বেদীটার ওপর বসে সামনে তাজের দিকে তাকিয়ে আছি। বেলা ডুবে এল। যমুনার দিক থেকে আচমকা এল একটা বাতাস। ঝাউগাছগুলোকে দুলিয়ে দিলে, একটা মর্মর শব্দ বেজে উঠল চারদিকে। কালো-হয়ে-আসা আকাশের নিচে ছায়া মাখানো তাজের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—

আবার বাইরে মাথা গলিয়ে দিলাম। কোথাও ছায়া নেই, দীর্ঘশ্বাসও নেই। মেঘবর্ণ ক্ষেতে খররৌদ্রের ধারালো ঝলক। বেলা এগারোটা বেজে গেছে। আর কত দেরি পৌঁছুতে ?

—সেই তাজমহলের চত্বরে বসে, যমুনার নীল জলের দিকে তাকিয়ে আমরা নতুন প্রেমের দীক্ষা নেব শান্তা—

আমি তাকিয়েই রইলাম বাইরের দিকে। রাস্তার পাশে

একটা কুকুর পড়ে আছে চ্যাপ্টা হয়ে, ধড় থেকে প্রায় আলাদা হয়ে গেছে তার মাথাটা—শুধু কতগুলো কালো কালো নাড়ির সংযোগ রয়েছে মাত্র। আলকাত্রার মতো চাপ বেঁধে আছে খানিকটা রক্ত—ভন্ ভন্ করে মাছি উড়ছে তার ওপর। এর আগে কোনো বাস্ কুকুরটাকে চাপা দিয়ে গেছে। পলকের জন্য দেখা দিয়েই দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল আবার।

এক ঝাপটা ধুলো এসে পড়ল চোখে, গলাটাকে আবার গাড়ির মধ্যে টেনে নিলাম।

গুন্ গুন্ করে গানের সুর আসছে। গাইছে শান্তা—চেনা গান ঃ

'দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা-লগনে—'

—ওই যে, ওই দেখো শান্তা। ওই যে তাজের চূড়ো দেখা যাচ্ছে।

—কই দেখি, দেখি—শান্তা উত্তেজিত ভাবে গলা বাড়ালো।

দাঁতে দাঁতে চেপে পাথর হয়ে বসে আছি। শেষ হয়ে এসেছে, শেষ হয়ে এসেছে এই দুঃসহ ক্লান্তিকর পথ চলা। দুঃসহতর দশই ফাল্গুন রাত্রিতে দিল্লী এক্স্প্রেসের সেই মারাত্মক ভিড়ের চাইতেও, আরো অসহ্য সেই দুঃস্বপ্নের মতো রাত্রির চাইতেও—যে রাত্রে উলুবেড়েতে অর্চনা মিত্রের বিয়ে হয়ে গেছে।

বাস্ উড়ে চলছে। শহর আসছে এগিয়ে, আসছে ইটের ভাঁটা, দুটি-একটি করে নতুন আর পুরোনো বাড়ি। ধুলোয় ভরা, সংকীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন আগ্রা শহর। তারই শ্বাসরোধী পরিবেশের মধ্যে, একটা পুরোনো বাড়ির তেতলায় ভাঙা চেয়ারে বসে কোম্পানীর লাভ-ক্ষতির হিসেব কষতে হবে আমাকে. প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে এই ডুবন্ত ব্যবসাকে আবার কী করে ডাঙায় তোলা যায়। আর সেই সময়, অশোক আর কুর্চিফুল-ফোটা ছায়াঘেরা পথ দিয়ে, শান্ত নির্জনতার মধ্যে দিয়ে সুধীর আর শান্তার টাঙ্গা এগিয়ে চলবে তাজের মর্মর স্বপ্নের উদ্দেশে, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন, নির্বোধ প্রেমের স্বপ্ন-বিলাসে।

—এসে গেছি।—সুধীরের কণ্ঠ।

—উঃ, কতদিন পরে তাজমহল দেখব।—শান্তার স্বরে সোচ্ছ্বাস আকুলতা।

—এবারের তাজ আর একটা নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেবে-আমাদের কাছে।

যমুনার ব্রীজ পার হয়ে এসেছে বাস, শহরের সংকীর্ণ পথ দিয়ে এবার হেলতে দুলতে চলেছে আগ্রা ফোর্টের নিচে তার টার্মিনাসে। সাড়ে এগারোটা—যাত্রা শেষ। জহরকোটের বোতামগুলো ভালো করে এঁটে নেবার আগেই চোখে পড়ল পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে অর্চনার ফোটোটা অনেকখানি বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

আগ্রা ফোর্ট-এ বাস থামল। কুলি, টাঙ্গা আর একাওয়ালারা চারদিক থেকে এসে দাঁড়িয়েছে।

আর সেই সময়! ক্ষমা কোরো সুকুমার, অকপট স্বীকারোক্তিই করছি আমি। জীবনে সব চাইতে বড় অপরাধের মুহূর্ত আমার সেদিন, তখন আমি খুন করতে পারতাম।

ওদের টাঙ্গাটা সামান্য কয়েক পা এগিয়েছে, পেছন থেকে বিশুদ্ধ উর্দুতে ডাক দিলাম।—ও বাঙালী বাবু, শুনছেন?

আশ্চর্য হয়ে মুখ বাড়ালো সুধীর। ভাঙা হিন্দিতে প্রশ্ন করল, আমাকে ডাকছেন?

—হাঁ, একটা জিনিস আপনি ফেলে গেছেন। কুলিকে পয়সা দেবার সময় পকেট থেকে পড়ে গেছে আপনার।

—এই টাঙ্গা, দাঁড়াও, দাঁড়াও!—সুধীর গাড়ি থামালো।

—এটা আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। অর্চনার ফোটোটা বাড়িয়ে দিলাম। চম্‌কে উঠলে সুকুমার? কিন্তু কী করব বলো। আজ তো আর ও ছবিতে প্রয়োজন আমার নেই। তাজের স্বপ্নের সঙ্গে ওর মিল ঘটতে পাবে, কিন্তু ছিপিটোলার সে পুরোনো তেতলা বাড়িটার সঙ্গে ও ছবি কোনোখানে মিলবে না।

ছবিটা নিয়ে হতবাক্ হয়ে গেল সুধীর।

—না, না—এ ছবি আমার নয়।

—আপনার পকেট থেকেই পড়েছে বাবুসাহেব, আমি কুড়িয়ে নিলাম।—আবার চোস্ত-উর্দুতে বললাম। হাসলাম বিগলিত বিনীত হাসি।

—কী বলছেন আপনি?—সুধীর প্রায় তেড়ে এল।

—ঠিক্‌ই বলছেন উনি—বজ্রগর্ভ মেঘের মতো কথাটা বললে শান্তা, তারপর সুধীরের হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলে ছবিটা।

—ও মশাই, শুনছেন, শুনছেন মশাই? —পেছন থেকে ডাক আসতে লাগল সুধীরের। কিন্তু ততক্ষণে একটা এক্কায় উঠে পড়েছি। বললাম, চালাও ছিপিটোলা—

সামনে দিগন্ত। ধূসর, বর্ণহীন, হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকের তারে বাঁধা। কাজ, কাজ, আর কাজ। অর্চনাকে আর মনে রাখলে চলবে না, তাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি, পৌঁছে দিয়েছি নীল যমুনা আর তাজের মর্মর স্বপ্নের কাছে।

—আরো জোরে হাঁকাও—

নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত সুরে বললাম তখন। বোঝা নেমে গেছে, এইবারে আরাম করে একটা সিগারেট ধরাতে হবে।

কল্যাণী চমকে উঠল : কী সর্বনাশ!

—খুব shocking লাগছে, না? কিন্তু—বিক্রম কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো কল্যাণীর দিকে : আমার কি কোনো প্রতিবাদ ছিল না? যা পাবো তাই মেনে নেবো?

আমি বললাম, কিন্তু এরা তো তোমার কাছে কোনো দোষ করে নি।

—তা করেনি বটে। কিন্তু একটা হিংস্র বিদ্বেষ যখন বিস্ফোরকের মতো ফেটে পড়তে চায়, তখন তো সে calculate করতে পারে না সুকুমার। তা ছাড়া, সমস্ত পৃথিবীকেই তখন

নিজের প্রতিপক্ষ বলে মনে হয়। সামনে যাকে পাওয়া যায় তাকেই নিষ্ঠুর হাতে আঘাত করতে ইচ্ছে করে।

ঘরের ঘড়িটা ঢং ঢং করে উঠল। আহতের মতো আর্তনাদ করে উঠল যেন। রাত এগারোটা।

বিক্রমের কেমন ঘোর ভাঙল। পাইপে তামাক ভরে নিলে আর একবার।

—অনেকক্ষণ ধরে বকে যাচ্ছি মিসেস্ গুপ্ত। ধৈর্যচ্যুতিও হয়তো হচ্ছে আপনাদের। কিন্তু কী করব, এই কথাগুলো কাউকে আমার বলবার দরকার ছিল। যেন কতকাল ধরে কাঁধের ওপর কী একটা বোঝা আমি বয়ে বেড়াচ্ছিলাম—সে বোঝা না নামানো পর্যন্ত তৃপ্তি কোথায় আমার!

সে যাক, গল্প বেড়ে যাচ্ছে, কাজেই কিছু খুঁটিনাটি এড়িয়ে যাচ্ছি। তুমি জানো না সুকুমার, কী অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা আমাকে এতকাল চাবুক মারছিল—যেন একটা অদৃশ্য সওয়ারের মতো আমার বুনো-ঘোড়ার মনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কোনো একটা অদ্ভুত প্রেতসত্তা!

হ্যাঁ—এইবারে ভাবলাম, আর ভুল করব না। আমি রাজপুত। বাংলা দেশের বংশীবটের ছায়ায় পথ ভুললে তো আমার চলবে না। আবুপাহাড়ের চূড়ো থেকে ডঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক আসে। আলেয়ার পেছনে আর নয়। আমি বিয়ে করব, হাঁ, নিশ্চয়ই করব।

বাঙালির মেয়েকে? না।

হয়তো জানো, আমাদের এক দল পূর্বপুরুষ এখন ভারত-বর্ষে নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, বিশেষ করে ইউ. পি-তে। আমাদের সম্পর্ক এখন খাঁটি মেবারী-চিতোরীদের সঙ্গে নয়, আমরা যাঁরা প্রবাসী রাজপুত—একটা আলাদা সম্প্রদায় গড়ে নিয়েছি নিজেদের মধ্যে। আমাদের যা-কিছু ক্রিয়া-কর্ম এই বিশেষ গণ্ডিটার ভেতরই সীমাবদ্ধ এখন।

বিয়ে ঠিক হল ফিরোজাবাদের কাছাকাছি একটা গ্রামে।

অনেক দিন বাংলা দেশে থেকে প্রায় কস্‌মোপলিটান হয়ে গেছি আমরা, কিন্তু এদেশের এরা এদের রাজপুত ঐতিহ্য হারায়নি এখনো। মাথায় উষ্ণীষ পরে বীরবেশে ট্রেন থেকে নামতেই দেখি সামনে এক প্রকাণ্ড তেজী ঘোড়া। যেমন বিরাট, তেমনি বন্য। ঘাড়ের ওপর থরে-থরে ফুলে উঠেছে সিংহের মতো কেশরগুচ্ছ, মাটিতে পা ঠুকছে অশ্রান্ত আর অশান্ত ভাবে। রোদে তার শরীরের মসৃণ রোমগুলি সিল্‌কের মতো চকচক করছে—যেন একটা ইস্পাতী দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে তার থেকে।

ঘোড়ার চেহারা দেখেই রোমাঞ্চ হল আমার। শারীরিক শক্তির বর্বরতাকে অশ্রদ্ধাই করে এসেছি চিরকাল, ভালো করে অশ্বারোহণটা আয়ত্ত ছিল না। তাও দু-একটা বাংলা দেশের বেঁটে টাটুতেই চড়া অভ্যেস, এই অতিকায় প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে আমার শ্বাসরোধ হয়ে এল।

ওরা তাড়া দিচ্ছিল। তাড়াতাড়ি করা দরকার, নইলে রোদ খুব চড়ে যাবে—ভারী তক্‌লিফ্‌ হবে তখন।

কী করব ভাবছি, হঠাৎ কন্যাযাত্রীরা ঠাট্টা করে উঠল।

—ভয় করছে নাকি দুল্‌হার ?

আর একজন সরস করে বললে, এই বরকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নেওয়া যাবে না, ডুলি চাই এর জন্যে।

সশব্দে হেসে উঠল একজন ঃ দুল্‌হা না দুল্‌হিন ?

হাসির হর্‌রা পড়ে গেল চারদিকে। ওরা কন্যাযাত্রী, উপলক্ষ্যটাও বিয়ে, সুতরাং উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাসবার অধিকার ওদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ওদের ওই নির্দোষ কৌতুক আমাদের কানে খুব মধুর হয়ে বাজলনা।

তাকিয়ে দেখি, অপমানে রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে বাবার মুখ। একে মেজর সাহেব, সব সময়ে মিলিটারি কেতা-দুরস্ত, তার ওপর আমার মতো জাত হারিয়ে বসেননি তিনি। তাঁর চোখ দুটো দিয়ে উত্তাপ ঠিকরে বেরুল! প্রকাণ্ড গোঁফজোড়ায় মস্ত একটা তা দিয়ে হাঁকলেন ঃ বেটা !

সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রের মতো সাড়া দিলাম আমি ঃ জী !

—কী বলছে ওরা, শুনতে পাচ্ছ ?

—জী।

—জল্‌দি করো বেটা—বাবা মেঘমন্দ্র স্বরে হুঙ্কার ছাড়লেন।

পিতৃরক্ত শিউরে গেল আমার শরীরের ভেতর দিয়ে। আর বিলম্ব করলাম না, এক লাফে চড়ে বসলাম ঘোড়ায়। সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়াও আর অপেক্ষা করল না, ছুটতে শুরু করল তীব্র-

বেগে। যেন ধনুক থেকে একটা তীর ছিটকে বেরিয়ে গেল দিগন্তের অভিমুখে!

প্রথম কিছুক্ষণ আতঙ্ক আর অস্বস্তির সীমা ছিল না, কী কষ্টে যে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছি সে আমিই জানি। শরীরের সমস্ত পেশীগুলোকে সংযত করে আটকে রইলাম জিনের ওপর। উদ্দাম গতিবেগের তাড়নায় মনে হতে লাগল, যে-কোনো মুহূর্তে ঘোড়ার ওপর থেকে আমি উড়ে বেরিয়ে যেতে পারি। এক একটা ঝাঁকানিতে যেন কোমরের তলার দিকটা খসে খসে পড়তে চাইছিল—আমি চোখের পাতা দুটোকে শক্ত করে চেপে ধরে ঝুঁকে রইলাম ঘোড়ার পিঠের ওপর।

কিন্তু আস্তে আস্তে সহজ হয়ে এল তার পর। তাকিয়ে দেখলাম, এ বাংলা দেশ নয়। মনে পড়ল সেই আগ্রা থেকে আলিগড়ের স্মৃতি; লাল মাটির রুক্ষ কঠিন বিস্তার তরঙ্গিত হয়ে গেছে সংখ্যাসীমাহীন রাশি রাশি টিলায় টিলায়! এখানকার ধাত্রী ধরিত্রী আরো কঠিন, আরো নীরস। অড়হরের ফিকে ছোপও ক্বচিৎ কখনো চোখে পড়ে। বাব্‌লা ছাড়া কোথাও কোনো গাছ নেই আর। আজ এদের সব কিছুর আর একটা নতুন তাৎপর্য ধরা পড়ল আমার কাছে। অর্চনার স্মৃতি একটা আগুনের হল্‌কার মতো একদিন এই রৌদ্রবিদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আজ সেই পৃথিবীই আমার মনের মধ্যে সঞ্চার করল নতুন গৌরব, নতুন পৌরুষ। নিজের মধ্যে

একটা অভিনব আত্মদর্শন হল এই মুহূর্তে। রাজপুতানা কখনো আমি দেখিনি, কিন্তু অনুভব করলাম—এই সেই রাজপুতানার মরুপ্রান্তর—সেই সূর্যবংশীদের দেশ।

সে কি অদ্ভুত আনন্দ! রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ললিত-সুরই খুঁজেছি, এবার আর একটা নতুন সুর ঝঙ্কৃত হতে লাগল কানের কাছে। বুকের মধ্যে তালে তালে রক্ত বলতে লাগল:

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন,
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটছে ঘোড়া, উড়ছে বালি,
জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন—

ঘোড়া ছুটতে লাগল। মনে হতে লাগল আমার বুকে বর্ম, কোমরে তলোয়ার, এক হাতে উদ্যত বর্শা। মরুভূমির পর মরুভূমি ছাড়িয়ে, আরাবল্লীর গিরিসঙ্কটের মধ্যে লাফে লাফে পাহাড়ী খাদ পেরিয়ে ছুটে চলেছি আমি। বাংলা দেশের শ্যামলতা নেই এখানে, নেই ময়নাপাড়ার মাঠ, নেই চোখভুলোনো মন-ভুলোনো কোনো শাল-পিয়ালের উৎসব। এখানে রুক্ষ মাঠে সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে, এখানে গরম বাতাসে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে যাচ্ছে কুঁকড়ে মরে যাওয়া বাবলার পাতা। ক্রমশ

এই রোদ প্রবেশ করল আমার রক্তে, আমার নেশা ধরিয়ে দিলে। আমেরিকার নিগ্রোরা যেমন কোনো এক একটা ঝড়ের রাত্রে ক্ষুব্ধ অরণ্য থেকে পিতৃভূমি কালো আফ্রিকার ডাক শুনতে পায়, তেমনি আমিও শুনলাম আমার আদিম পিতৃভূমির ইশারা, নিজেকে পূর্ণ করে নিলাম আমাদের বিস্মৃত অতীতের উগ্র আগ্নেয় নির্যাসে। ইচ্ছে করতে লাগল—সমস্ত শরীরের শক্তি নিয়ে প্রচণ্ড বলে একটার পর একটা বর্শা দিগন্তের বুকে ছুঁড়ে দিই আমি। জ্বলন্ত শিশা দিয়ে গড়া আকাশটা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাক, আঘাতে আঘাতে উচ্ছলিত রক্তের মতো তরল আগুন গলে গলে পড়ুক। আজ মনে হয়, সেই সময় আমার মুখ দেখলে তোমরা ভয়ে শিউরে উঠতে। আমার ভেতর থেকে যেন একটা নতুন মূর্তি বেরিয়ে এসেছিল, বেরিয়ে এসেছিল অতীতের কবর ফুঁড়ে একটা প্রেতসত্তা।

ঘোড়া যেখানে গিয়ে থামল দেখি সেটা একটা দস্তুরমতো কেল্লা। যদিও মাটির, তবু দুর্গের মতো প্রকাণ্ড উঁচু; তেমনি বিশাল প্রাচীর, সামনে তেমনি পরিখা, তেমনি ফটকের পর ফটক পেরিয়ে তবে তাব অন্তঃপুর। আমার শ্বশুর এদিককার বনেদী জমিদার। কিন্তু বাংলা দেশের জমিদারের মতো দোল-দুর্গোৎসব আর মামলা করা জমিদার নয় এরা। এখনো দরকার হলে আদালতে যাওয়ার আগে এরা খণ্ডযুদ্ধ করে নেয়—সুযোগ পেলেই দু-দশটা মানুষের কাঁচা মাথা নামিয়ে দেয় তৃষ্ণার্ত শুকনো মাটিতে।

বাড়িগুলো গড়বার পেছনেও এই ইতিহাস। ইংরাজ আসবার পরেও বহুদিন জোর-যার মুল্লুক-তার নীতি চালিয়ে গেছে এরা। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ও উপযুক্ত সক্রিয় ভূমিকা এরা গ্রহণ করেছিল—এদের রণ-হুঙ্কারে কাঁপিয়ে দিয়েছিল ইংরেজের নতুন সাম্রাজ্যের বনিয়াদ। কিন্তু সেইখানেই এদের অপমৃত্যুও বটে। অযোধ্যার নবাব, ঝাঁসির রাণী, কুমার সিংহের সঙ্গে এদেরও সমস্ত স্বাধীনতার অবসান।

বিয়েও হল পুরোনো পদ্ধতিতে—বরকে করা হল বীরবরণ। স্বপ্ন দেখলাম যেন রাজপুতানার কোনো গিরি-দুর্গে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছি কোনো রাজকুমার। বিয়ের এই লগ্নটুকুই আমার যা কিছু অবকাশ, তারপরেই মরণের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে গিয়ে। শত্রুসৈন্য গিরি-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে, তাদের বাধা দিয়ে ফেরাতে হবে, নইলে প্রাণ দিতে হবে। আমাকে ডাকছে আমাদের সমস্ত ইতিহাস। বাপ্পা, হামীর, জয়মল্ল, পুত্ত, সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ। আমার কানের কাছে ক্ষুধার্ত গর্জন শুনছি ঃ ম্যয় ভুখা হুঁ। শুধু মাঝখানে এই কয়টি মুহূর্ত। দেশ নেই, কাল নেই—সময় নেই। সীমাবদ্ধ সময়ের আকাশে কক্ষ-পরিক্রমা করতে করতে একটা আকস্মিক শূন্য শান্ত অবকাশে এসে আমি দাঁড়িয়েছি।

শ্বশুর এসে যৌতুক দিলেন একখানা ধারালো তলোয়ার—যেমন দীর্ঘ, তেমনি উজ্জ্বল। হাতে ধরতে গা ছমছম করতে লাগল, মনে হতে লাগল এ নিয়ে যে-কোনো মুহূর্তে যে-

কোনো লোককে হত্যা করতে পারি আমি। আর সেই তলোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে তুলে দিলেন তেম্‌নি দীপ্তিমতী একটি কন্যাকে। ঘোমটার আড়ালে তার মুখ দেখলাম, যেন একটা মশালের শিখা স্তব্ধ হয়ে আছে।

বিয়ের আসরে বাঈ নাচের রেওয়াজ আছে ওদেশে। ঘুরে ঘুরে বাঈজী এসে বরকে গান শোনালো। কী সে গান?

বিচিত্র সে গানের বিষয়বস্তু। সে মনে করিয়ে দিলে, সৈনিক, তোমাকে তো বসে থাকলে চলবে না। যুদ্ধের দামামা বেজেছে, ঘোড়ার ক্ষুর চঞ্চল হয়েছে, তোমার তলোয়ারে ঝঞ্ঝনা জেগেছে। হে কুমার, তুমি কি এখনো শীস্‌মহলে বসে হাজারো আয়নায় তোমার মুখ দেখবে? কিংবা হাওয়া-মহলের বাতায়নে দাঁড়িয়ে নিশ্বাসে নিশ্বাসে টেনে নেবে জুঁই-চামেলী—গোলাবের প্রাণকাড়া গন্ধ? রাজপুত, তুমি কি জানো না, স্বাধীনতার জন্যেই তোমার জন্ম, স্বাধীনতার জন্যেই তোমার মৃত্যু? যদি না জানো, তোমার প্রিয়াকে প্রশ্ন করো। দেখবে কখন তোমার বুক থেকে মালা খুলে নিয়ে তোমায় সে বর্ম পরিয়ে দিয়েছে। রাজা যশোবন্তের মহিষীর মতো সে বলছে ঃ আমার স্বামী যুদ্ধে জয়লাভ করতে জানে, অথবা প্রাণ দিতে জানে। সে তো কখনো পালিয়ে আসতে শেখেনি! কুমার, নিজেকে তুমি ভুলো না!

ভাবলাম, না, কোনো মতেই আর ভুলবনা। তারপর বউকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম আমি।

কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম, ফিরোজাবাদের মাটি আর কলকাতা একেবারেই আলাদা। এখানে সে রোদ ওঠে না তেমন করে— বিচ্ছিন্ন পাতাঝরা ন্যাড়া ন্যাড়া বাবলা গাছ আর ঢেউ-তোলা কাঁকর মাটির পরিবেশে তা মদের মতো সঞ্চারিত হয়ে যায় না রক্তের ভেতরে। সম্ভ্রম জাগায় না দুর্গের মতো সেই প্রকাণ্ড পুরোনো বাড়িটা—ঝাড়বাতির ঝলমলে আলোয় ঝকঝক করে ওঠে না শানানো একখানা জ্বলন্ত সুদীর্ঘ তলোয়ার। মনে পড়ে না সেই বাঈজীর গানের রাজকুমারকে, যার বুকের রক্তের রঙ মেখেই আরাবল্লীর পাহাড়ে সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়। এখানে আমি কেরানী, এখানে বর্ম ফেলে অফিসের পোশাক পরে আমাকে ট্রামে উঠতে হয়!

বউ রূপবতী, কিন্তু রূপের নেশা কাটতে খুব বেশি সময় লাগল না আমার। রাজপুত-কন্যা যে এত সাধারণ, এত গ্রাম্য এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বন্ধুরা পরিচয় করতে এসে হাসে ব্যঙ্গের হাসি, ঠাট্টা করলে ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ দুটিকে নির্বুদ্ধিতায় কুৎসিত করে বউ তাকিয়ে থাকে হাবার মতো। মনে পড়ে নিমুকে—যার ভালো নাম পূর্ণিমা। যাকে হয়তো আমি পেলেও পেতে পারতাম সেদিন!

বাঙালির বিরুদ্ধে অভিযান করে বীর-নারী বিয়ে করে আনলাম, কিন্তু এ কী রকমের বীরাঙ্গনা! বীরত্বের মধ্যে আপাতত দেখছি অক্লান্ত ভাবে খাটতে পারে, বাড়িতে এক গণ্ডা চাকর-বাকর থাকতেও নিজের হাতেই ভারী ভারী ফার্নিচারগুলো

টেনে-টুনে সরিয়ে দিতে পারে এদিক-ওদিক। অসহ্য করে তুলল তো! চটে গিয়ে ভাবতে লাগলাম, এ আবার কী জ্বালাতন! যদি মোট বইবার জন্যই বিয়ে করবার দরকার ছিল, তা হলে একটা গাধা বিয়ে করলেই তো চুকে যেত ল্যাঠা। অত কষ্ট করে তবে আর গেলাম কেন ফিরোজাবাদে!

এবার এল আত্মপ্রবঞ্চনার পালা।

তুমি কি সেন্টিমেন্ট্‌টা বুঝতে পারছ সুকুমার? ধন্যবাদ। আমার যে কী বিশ্রী অনুতাপ চাড়া দিয়ে উঠল, ভাষায় তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বউকে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে খাটতে দেখে গা নিস্‌পিস্‌ করতে লাগল—দেখলাম জোয়ালে বাঁধা গোরুর সীমাহীন নির্বুদ্ধিতা ওর চোখে-মুখে নির্ভুলভাবে আঁকা।

আমি চেষ্টা শুরু করলাম। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম নিজেকে ভোলাবার জন্যে। মনে আনতে চাইলাম সেই বিবাহ-উৎসবের স্মৃতি—সেই তেজী মস্ত ঘোড়াটায় চড়ে ছোটবার সময় রক্তের মধ্যে দুর্গম বন্ধুর আরাবল্লীর ডাক। সেই বল্লম ছুঁড়ে দিয়ে দিগন্তের বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করে ফেলা! ভাবতে চেষ্টা করলাম, বিয়ের বাসরে মস্ত একখানা ধারালো তরোয়াল থেকে একটা উগ্র প্রখর দ্যুতি এসে ছড়িয়ে পড়েছে আমার বধূর মুখে—আমাদের ঐতিহাসিক বীরাঙ্গনাদের মতো জ্যোতির্ময়ী করে তুলেছে তাকে। আর সেই বাঈজীর গান: হে কুমার, তোমার বধূর দিকে তাকাও, দেখো, সে তোমার বুক থেকে মালা খুলে নিয়ে তোমায় বর্ম পরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু উপায়ই নেই। ইস্পাতে মরচে ধরে গেছে বাংলা দেশের নোনা জলো-হাওয়ায়। যাকে আগুন ভেবেছিলাম, দেখছি তা একটা স্যাঁৎসেঁতে ভিজে ন্যাকড়ার চাইতে বেশি নয়। তা ছাড়া এ জীবনও খাপ খাচ্ছে না তার। তার মন চাইছে সেই ফিরোজাবাদের গ্রামে ফিরে গিয়ে প্রাণপণে জলচক্র ঘোরাতে, ঘটর ঘটর ঘরঘর করে জাঁতা পিষতে! বীরত্ব বলতে ওইটুকুই—একটা ভারবাহী জন্তুর খানিক কায়িক শ্রমশক্তি—তার অদম্য কর্মপ্রেরণা। বেশ বুঝলাম, রাজপুত-গৌরব শুধু একটা খোলস মাত্র, তরোয়ালটা শুধুই সাজিয়ে রাখবার জিনিস। তাতে ধার তো নেই-ই, ভারও আছে কি-না গভীর সন্দেহ জাগল সে বিষয়ে।

ফিরোজাবাদের নেশা কাটবার সঙ্গে সঙ্গে মনে চরম প্রতিক্রিয়া এল একটা। বুঝলাম, এখানেও ভুল করে ফেলেছি। সারা জীবন এই অসহ্য বোঝাটা এখন নিতান্ত অসহায় ভাবে বয়ে বেড়াতে হবে। অথচ ঠিক সেই সময়েই দেখেছি পথ দিয়ে চলেছে বাঙালির মেয়েরা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কথা কয়ে উঠছে তাদের চলার তালে তালে। মণিকা পূর্ণিমা আর অর্চনাদের সেই শোভাযাত্রা দেখে মধ্যে মধ্যে নিজের হাত কামড়ে খেতে ইচ্ছে করেছে যেন। অর্থ আছে আমার, বিদ্যা আছে, রূপও যে নেই তা নয়। তা ছাড়া আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি-সমাজে ইণ্টার-প্রোভিন্‌শিয়াল ম্যারেজও আজ আর নতুন কথা নয়। কেন একটা রোম্যাণ্টিক্ বোকামিতে ওভাবে আমি পূর্ণিমাকে

ছেড়ে এলাম? ভবানী কি সত্যিই অকৃতজ্ঞ হতো অতটা? এতই কি দুঃসহ ছিল অর্চনার সেই বিট্রেয়াল? কিছু দিন ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে কি আমিও—?

মনে হল ভয়ানক ঠকানো হয়েছে আমাকে। ইচ্ছে করেই যেন আমাকে সম্মোহিত করবার উদ্দেশ্যে ওই পরিবেশটা রচনা করা হয়েছিল—ওই মাঠ, ওই রৌদ্র, ওই ঘোড়া, ওই তলোয়ার! এ যেন আমাকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে একটা কুহক সৃষ্টি—একটা কুটিল ক্রূর চক্রান্ত।

কে অমন করে সেদিন চারদিকের পৃথিবীকে সাজিয়ে রেখেছিল? আমার ওপর ভর করেছিল কোন্ প্রেত—দুপুরের দীর্ঘশ্বাসের মতো বাতাসে বয়ে যেতে যেতে হঠাৎ খানিক কৌতুক করে গিয়েছিল আমাকে নিয়ে? তাই মরুভূমিতে ছুটতে ছুটতে নতুন মরীচিকা দেখলাম একটা—দেখতে পেলাম একটা অবাস্তব মরূদ্যান। ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার আছড়ে পড়ল সাহারার অগ্নি-শয্যায়, হাতের শাণিতাগ্র বল্লমটা বালিতে বিদ্ধ হয়ে আকাশে মুখ তুলে রইল শেষ প্রতিবাদের মতো। তারপর দিগন্তে দিগন্তে মরু দেবতার মারণ-দণ্ডের মতো রুদ্র-ঝংকার জাগিয়ে ছুটে এল প্রচণ্ড সাইমুম। তার গতিবেগে বালির স্তূপ এসে আমার অস্থি-কঙ্কালকে হারিয়ে দিলে, আমি মরে গেলাম, আমি ফুরিয়ে গেলাম!

মরে গেলাম!

ক্রমে ক্ষেপে উঠবার উপক্রম হল আমার। শেল্‌ফে

সাজানো রবীন্দ্রনাথের বইগুলো যেন ব্যঙ্গ করতে লাগল আমাকে। যখন তখন কানের কাছে মণিকা সেনের হাসিটা ভেঙে পড়তে লাগল তীব্র বিদ্যুতের মতো—তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর চাবুকের ঘায়ের মতো। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনতে লাগলাম, বিয়ের আসরের সেই বাঈজীর গান আমার কানে কামানের গর্জনের মতো বাজছে।

এ আর সহ্য হয় না। তোমার কাছে একটা অকপট স্বীকারোক্তি করি—মাপ কোরো সুকুমার। শেষে একদিন ধৈর্যের বাঁধটা ভেঙে উড়ে গেল বন্যার মুখে। ধাঁ করে অবশেষে একটা লাথিই কষিয়ে দিলাম প্রেমকুমারীকে, অর্থাৎ স্ত্রীকে।

তীরের মতো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো প্রেমকুমারী। অদ্ভুত আশায় আর উত্তেজনায় আমার বুক দোলা খেয়ে উঠল—জাগল একটা হিংস্র আনন্দ। মনে হল, এবার সে বিদ্রোহ করবে, খানিকটা তীব্র কলহ করবে—হয়ে যাবে একচোট শক্তির পরীক্ষা। বেঁচে যাব আমি। প্রাণভরে প্রকাণ্ড নিশ্বাস টেনে নিতে পারব একটা।

কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই করল না। নিঃশব্দে চলে গেল ঘর থেকে।

বিশ্বাস করো সুকুমার, হাতের কাছে একটা রিভলভার থাকলে তক্ষুণি ওকে গুলি করতাম আমি। চীৎকার করে ডাক দিয়ে বললাম, কোথায় যাচ্ছো?

স্থির শান্ত গলায় উত্তর এল: আমার এখন অনেক কাজ।

অসহ্য ঘৃণায় ইচ্ছে করতে লাগল, নিজের গলা নিজের হাতেই শক্ত করে টিপে ধরি। এ আমি করেছি কী! কার প্রতিশোধ কার ওপরে নিলাম! শান্তা আর সুধীরদার ফাটল এতদিনে নিশ্চিহ্নভাবেই জুড়ে গেছে—মাঝখান থেকে আমারই সব চেয়ে হার হল—আমিই বোল্‌ড্‌-আউট হয়ে গেলাম।

ভুল হয়েছিল সুকুমার, আগাগোড়াই ভুল। এখন বুঝতে পারছি, লাথিটাকে ও অপমান বলে মনে করেনি। বরং ওতে করে পৌরুষের পরিচয়ই পেয়েছে আমার—পেয়েছে নিষ্ঠুর কঠিন একটা শক্তির পরিচয়। ওই লাথিটাতেই আমার মধ্যে দেখেছে ক্ষত্রিয়কে—বুঝেছে আমার ভেতরে জেগে উঠেছে আমার সত্যিকারের রক্ত-গৌরব। এর পর থেকে ও আরো বেশি করে আমার বশ্যতা স্বীকার করবে, থাকবে আরো দীনাতিদীন হয়ে। বীরের সেবা করবার জন্যেই বীরাঙ্গনা তার ধ্যান-জ্ঞান তপস্যা নিয়োগ করবে—আমার লাথিগুলি হবে ওর প্রতি আমার মহিমময় পতিত্বের সগৌরব স্বীকৃতি।

কিন্তু বীরাঙ্গনা! সেটা হয়তো শত্রু এলে—কোনো সম্মুখ সমরের সময়। কিন্তু আপাতত যখন সে সুযোগ নেই, তখন পাতিব্রত্যই তার একমাত্র আচরণীয়! ভাবতেও আমার দম আটকে আসতে লাগল, মনে হতে লাগল, একদিন কি আত্ম-হত্যাই করতে হবে আমাকে!

কিন্তু আশ্চর্যভাবে ভার নেমে গেল একদিন। আগের চাকরি ছেড়ে তখন অর্গানাইজার হয়েছি বড় একটা ব্যাঙ্কের। বড় ব্যাঙ্ক—সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তাদের অর্গানাইজেশন। মানসিক অস্বস্তির দিক থেকে বিচার করে চাকরিটাও জুটেছিল ভালো। এও টুরিংয়ের ব্যাপার। আজ দিল্লী, কাল করাচী, পরশু মাদ্রাজ—এই করেই দিনগুলো কাটছিল। মনের চঞ্চলতা রূপ পেয়েছিল কর্মজীবনে—একেবারে মন্দও যে লাগছিল তা নয়। বাইরের গতিবেগ যেন খানিক উদ্দাম বাতাস আনছিল আমার ফুসফুসের মধ্যে, খানিকটা সজীব সরসতার সঞ্চার করছিল!

সেদিন দিল্লী যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে। পথের মাঝখানে হঠাৎ ট্যাক্সিটা গেল খারাপ হয়ে। বেশ রাত হয়েছে, তার ওপর শীতকাল—জায়গাটাও এমন যে সহজে ট্যাক্সি পাওয়ার জো নেই। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গাড়িটা যখন ঠিক হল, তখন আর স্টেশনে গিয়ে লাভ নেই। অগত্যা ফিরলাম বাড়ির দিকেই।

নিজের ঘরের দরজায় পা দিয়েই চমকে উঠলাম। একবারের জন্যে সতর্ক মন জানান দিল: ভুল জায়গায় ঢুকে পড়েছি নাকি! না—ঘর ভুল করিনি এটা সত্যি। তবে সময়টা যে ভুল হয়ে গেছে এটা নিঃসন্দেহ—এখন আমার ফিরে আসাটা উচিত ছিল না!

ভেতর থেকে গানের শব্দ—রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

দরজাটা ভেজানো ছিল, খুলে ফেললাম নিঃশব্দে। দেখলাম, আমার অর্গানে বসে গান গাইছে আমার বাঙালি বন্ধু প্রবোধ মিত্র—তার পাশ ঘেঁষে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে দাঁড়িয়ে প্রেমকুমারী। সেই অতি নির্বোধ মেয়েটা, যাকে আমি একটা ভারবাহী পশুর বেশি কিছুই ভাবতে পারিনি!

খুব 'শক' লাগল? না—একেবারেই না।

জুতোর সজোরে শব্দ করে ঢুকলাম ঘরে। দেখলাম চকিতে ছাইয়ের মতো পাণ্ডু হয়ে গেছে দুজনের মুখ। এখন মনে নেই ঠিক, খুব সম্ভব হেসে উঠেছিলাম আমি। ধীরে-সুস্থে একটা সোফায় বসে পড়ে অবশেষে বললাম, ভয় নেই প্রবোধ, শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

প্রবোধের আতঙ্ক-বিহ্বল ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল থরথর করে, জবাব দিলে না।

পকেটে রিভলভারটা লোড্ করাই ছিল, তক্ষুণি দুটো খুন আমি করতে পারতাম। হয়তো করতামও—একবার বোধ হয় হাত দিয়ে চেপেও ধরেছিলাম অস্ত্রটা। কিন্তু কেন কে জানে, হিংসার গতিটা হঠাৎ মোড় ঘুরে গেল সীমাহীন একটা উদারতায়। হয়তো এই হয়! মানসিক স্পীডোমীটারের কাঁটা ঘুরিয়ে দিলে চরম চাওয়ার পরের অঙ্ক চরম বৈরাগ্যে এসে সে নামে বুঝি!

—তুমি প্রেমকে ভালোবাসো?

মাথা নিচু করে রইল প্রবোধ, উত্তর দিলে না।

—আর প্রেম, তুমি ?

প্রেমের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কথা বললে না সে। আমি জানি, এই মুহূর্তে আমার লাথিটা সে আর প্রত্যাশা করে না।

কিন্তু এই নীরবতা আর ওই চোখের জল--দুইয়ের অর্থই তখন পরিস্ফুট হয়ে গেছে আমার কাছে।

আস্তে আস্তে প্রবোধ বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমি প্রবল শব্দে ধমক দিলাম একটা।

—কোথায় যাচ্ছ ?

পাথরেব মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গেল প্রবোধ।

—পালিয়োনা !—আমি গর্জন করলাম।

প্রবোধের ঠোঁট দুটো তেমনি নড়তে লাগল। হয়তো নিজের নার্ভাস্‌নেস্‌টা কাটাবার জন্যেই একটা রুমাল নিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল।

—যদি সাহস থাকে, নিয়ে যাও ওকে। ঘর বাঁধো। ওর ওপর থেকে সমস্ত দাবি আমি ছেড়ে দিলাম। প্রেম, চলে যাও—

হঠাৎ যেন কেমন একটা শক্তি পেল প্রবোধ। ভয় কেটে গেছে, যেন ভর দিয়ে দাঁড়াবার মতো পেয়েছে কোনো একটা শক্ত ডাণ্ডা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে : Do you mean it seriously ?

আমি গর্জন করলাম : I mean everything seriously.

—Very well, then !

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল ওরা। বিশ্বাস করো সুকুমার, ওরা চলে গেল। বড়লোকের একমাত্র ছেলে প্রবোধ, সমাজ নেই ওর, ভয়ও নেই বিন্দুমাত্র। প্রেমের কষ্ট হবে না। ওর সামনে এখন রবীন্দ্র-সংগীতের পৃথিবী, একটা নতুন জীবন, নতুন স্বপ্ন। আর আমার সমস্ত স্বপ্নের সমাধি—। আমার মৃত দেহপঞ্জরের ওপর মরুঝড় সাইমুম এখন বালির শবাস্তরণ বিছিয়ে দিচ্ছে !

ভুল হয়ে গেছে সুকুমার, এখানেও ভুল। বৈপরীত্যের কথাটা আমার মনে ছিল না। রাজপুতের মেয়ে এনে আমি ভুলতে চেয়েছিলাম বাংলা দেশকে, কিন্তু বাংলা দেশই ভুলিয়ে নিলে রাজপুত-কন্যাকে। যখন দরকার ছিল শক্তির, তখন আমি গান গাইতে চেয়েছিলাম; যখন এল গানের পালা—তখন শক্তির মোহে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম আমি।

কাচের শো-কেসের মধ্যে সেই তলোয়ারখানা ঝলমল করছিল—ঝলমল করছিল একটা হিংস্র হাসিতে। ওইটের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নতুন একটা পরিকল্পনা এল মনে। রাজপুত আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য আমি আনতে পারিনি। কিন্তু একটা সমাধান আছে। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলায়, চরম বিধর্মিতায়।

যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন। দরখাস্ত করলাম 'কমিশনের' ! চেহারা ছিল, রেফারেন্স ছিল, বিদ্যা ছিল। পেয়ে গেলাম।

এবার সত্যিসত্যিই বেদুয়িনের অভিসার। লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজপুতের শূন্যতার সাধনা—ধারালো বল্লম দিয়ে দিগন্তের বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দেওয়া—সেখান থেকে রক্তের মতো তরল আগুন গলে পড়বে!

তার পরের জীবনটা ঝড়ের। যুদ্ধের নেশা ধরল, নেশা ধরল রক্তের। বান ডেকে গেল উচ্ছৃঙ্খলতার। মদ, ধরলাম, শুরু করলাম চূড়ান্ত বীভৎসতা। একটা পাশবিক হিংস্রতায় গেলাম তলিয়ে। ফ্রণ্টের রক্ত আর ক্যাম্পের নারী। মানুষের রক্তের সঙ্গে মদের শোণিত-বর্ণে আর কোনো পার্থক্য দেখতে পেলাম না—জীবিত আর মৃত মানুষের রক্ত এক হয়ে গেল আমার কাছে। রাজপুতের বরযাত্রী রূপান্তর পেল—মরুচর বেদুয়িনের আদিম বুভুক্ষার ভেতর। শুনেছি রাজপুতেরা অনার্য হূণের বংশধর—আমার প্রতিটি শিরা-স্নায়ুতে সাড়া দিলে সেই হূণ—সেই আদিমতম সত্তা।···

···হঠাৎ বিক্রম উঠে দাঁড়ালো।

—আজ এখন চলি সুকুমার, অনেক রাত হয়ে গেছে। —ঘড়ির দিকে তাকালো সে: রাত সাড়ে বারোটা বাজে। অনেকক্ষণ বকে গেলাম। কিন্তু সময় ছিল না আর। দু'দিনের ছুটিতে দানাপুর থেকে এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলাম, কাল ফিরে যাব। বাই দি বাই, সেই মণিকা সেনের খবর জানো কিছু?

বললাম, না। বড়লোকের মেয়ে—বেশি খাতির জমতে

পায়নি। বি. এ. পাশ করেই কলকাতায় চলে আসে, তারপর আর কোনো খোঁজ রাখিনি তার।

বিক্রম মৃদু হাসল। বললে, হ্যাঁ, যে কথাটা বলবার জন্যে আমি এসেছিলাম। আবার বিয়ে করব ঠিক করেছি। আমার চাইতেও স্কাউণ্ড্রেল এক ডবলু. এ. সি.র ক্যাপ্টেনকে। ভেবে দেখেছি, মণি-কাঞ্চন যোগ হবে। যুদ্ধ অনেক কথাই শিখিয়েছে, তার মধ্যে এটাও শিখিয়েছে: Take it easy, take it easy!

আমি তাকিয়ে রইলাম।

বিক্রম বললে, ভয় নেই, খাঁটি আর্যসমাজী মতে। বিয়ের বাসরে অন্তত কোনো রকম বেয়াড়াপনা ঘটবে না, এ প্রতিশ্রুতি তোমায় আমি দিতে পারি। পারো তো একবার যেয়ো সুকুমার। বাস্তবিক, অত্যন্ত খুশি হবো।

—কোথায়?

—দানাপুরে। বেশি দূরে নয়। পরশু বিয়ে। কার্ড রইল—সন্ধ্যের মধ্যে এই ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছুলেই চলবে। আর ঘাবড়াবার সত্যিই কোনো কারণ নেই। মাননীয় অধ্যাপকের মর‍্যালিটি যাতে কোনো রকমে আহত না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।—হেসে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিলে বিক্রম। পাউচ থেকে তামাক নিয়ে ধরালো পাইপটা, তারপর বললে, আচ্ছা, আসি ভাই। চললাম মিসেস গুপ্ত। এ

বিয়েতে অবশ্য আপনাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আর অপ্রস্তুত করলাম না। জানি, এ সব বিশ্রী ব্যাপারে আপনি যেতে রাজী হবেন না! After all we must be civil with a lady —হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিশ্রী বেখাপ্পা গলায় হাসল বিক্রম—যেন এতক্ষণের আচ্ছন্ন জড়তাটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চাইল; ছিঁড়ে দিতে চাইল এতক্ষণ ধরে গড়ে তোলা তার কাহিনীর এই বিচিত্র জালটা। কিন্তু সে অট্টহাসিতে আমাদের মোহভঙ্গ হল না—সেটাকে নিছক কৃত্রিম একটা দুর্বল প্রয়াস বলেই বোধ হল। ভিজে বর্ষাতিটা কাঁধে ফেলে তেমনি বেরিয়ে গেল বিক্রম—বেরিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে। দেখলাম, ঝাপসা-হয়ে-আসা ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় রহস্যঘন ঝাউবীথির তলা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর মিলিটারী ইউনিফর্মপরা দীর্ঘ দেহটা।

অভিভূত ভাবটা কাটাতে খানিকক্ষণ সময় লাগল আমাদের। তারপরে কল্যাণী বললে, অদ্ভুত।

কার্ডটা উল্‌টো ভাবে পড়েছিল টেবিলের ওপর। অন্যমনস্ক ভাবে সেটাকে হাতে তুলে নিয়েই আমার দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে গেল। কার্ডটার অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এই রকম:

"ফ্লাইট অফিসার বিক্রমজিৎ সিংহ ডবলু. এ. সি.র ক্যাপটেন মিস্‌ মণিকা সেনের সঙ্গে তাঁর শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে মিস্টার সুকুমার গুপ্তের উপস্থিতির আনন্দ লাভের বাসনা করেন—'

হাতে থেকে খসে পড়ল কার্ডটা। এলোপাথাড়ি হিট করতে করতে শেষ পর্যন্ত ট্রফিটা জিতেই নিয়েছে বিক্রম!

ঢং করে সাড়ে বারোটা বাজবার শব্দটা রাত্রির বুকের ওপর হাতুড়ির ঘায়ের মতো এসে পড়ল॥